وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

● ৫ম বর্ষ ● ৫ম সংখ্যা ● মার্চ ২০২১

Web : www.al-itisam.com

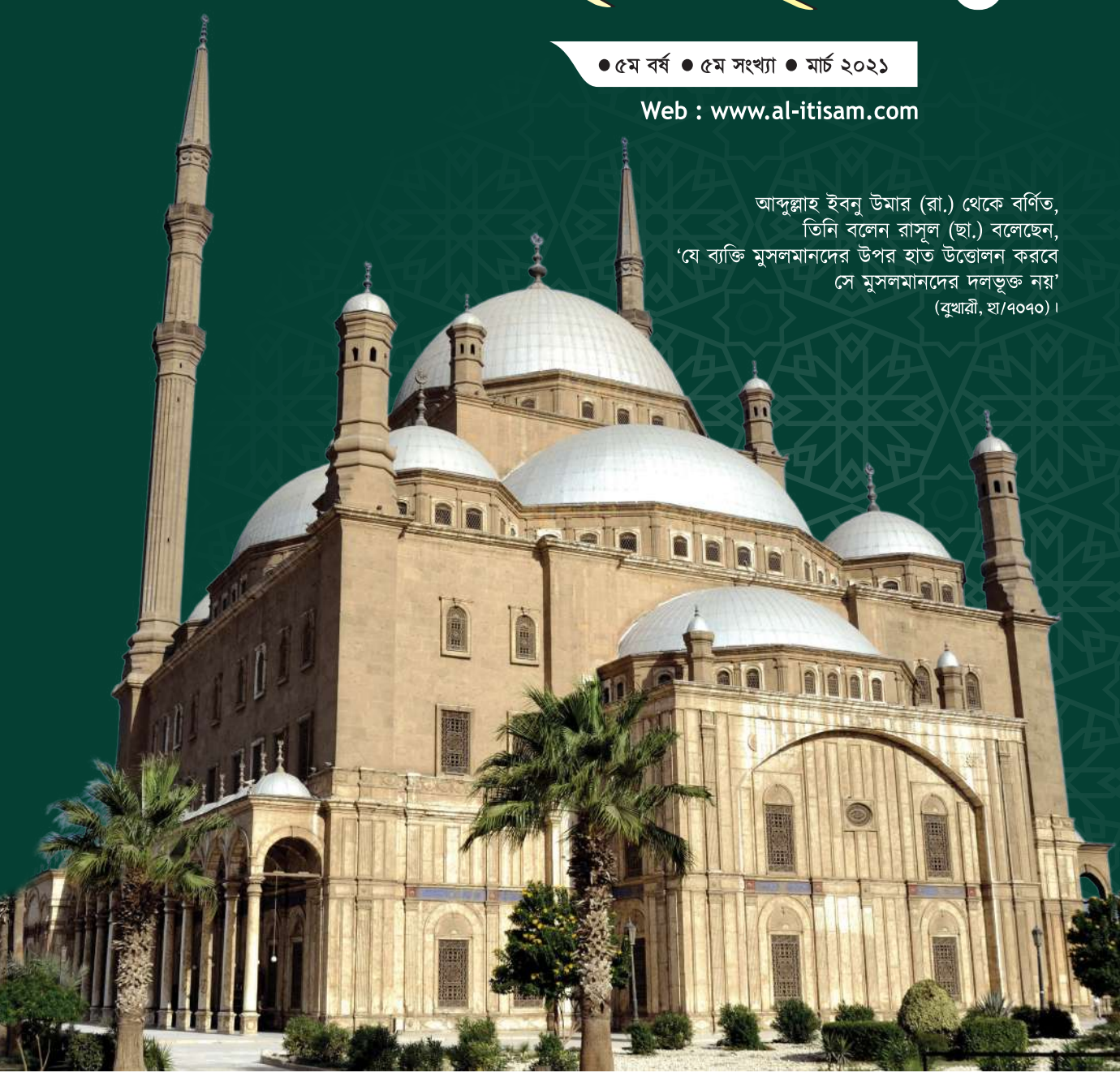

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (ছা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মুসলমানদের উপর হাত উত্তোলন করবে সে মুসলমানদের দলভূক্ত নয়’ (বুখারী, হা/৭০৭০)।

সূচিপত্র

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.

السنة: ٥، رجب و شعبان ١٤٤٢ ه/ مارس ٢٠٢١ م العدد: ٥، الجزء: ٥٣

تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش

رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف

التحرير و التنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

Monthly AL-ITISAM

Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**

Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**

Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.

Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi; Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203

Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি

মুহাম্মাদ আলী মসজিদ মিশরের কায়রোর ঐতিহাসিক মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের অন্যতম ব্যতিক্রমি নিদর্শন ‘মুহাম্মাদ আলী মসজিদ’ কায়রো দুর্গের অভ্যন্তরে পুরাতম মামলূক অট্টালিকার পাশে অবস্থিত। মিশরের শেষ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ আলী কর্তৃক (১৮৩০-৪৮ খ্রি.) নির্মিত হয়। এর স্থপতি ইউসুফ বুশনাক। মসজিদটিতে ৫-টি গম্বুজ ও ২-টি মিনার রয়েছে। মসজিদ অভ্যন্তরে মার্বেল পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে একসঙ্গে ১০হাজার মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারে।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪২ ॥ খ্রিস্টাব্দ ২০২১ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪২৭

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ মার্চ	১৬ রজব	সোমবার	৫ : ০৫	৬ : ১৯	১২ : ১১	৩ : ৩১	৬ : ০২	৭ : ১৬
০৫ ,,	২০ ,,	শুক্রবার	৫ : ০১	৬ : ১৬	১২ : ১০	৩ : ৩২	৬ : ০৪	৭ : ১৮
১০ ,,	২৫ ,,	বুধবার	৪ : ৫৭	৬ : ১১	১২ : ০৯	৩ : ৩২	৬ : ০৬	৭ : ২০
১৫ ,,	০১ শা'বান	সোমবার	৪ : ৫২	৬ : ০৬	১২ : ০৭	৩ : ৩২	৬ : ০৮	৭ : ২৩
২০ ,,	০৬ ,,	শনিবার	৪ : ৪৭	৬ : ০১	১২ : ০৬	৩ : ৩২	৬ : ১০	৭ : ২৫
২৫ ,,	১১ ,,	বৃহস্পতিবার	৪ : ৪১	৫ : ৫৬	১২ : ০৪	৩ : ৩১	৬ : ১২	৭ : ২৭

সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	০	+১	০
নারায়ণগঞ্জ	-১	০	-১
নরসিংদী	-১	-১	-২
কিশোরগঞ্জ	+৫	+৫	+২
টাঙ্গাইল	+২	+৩	+২
ফরিদপুর	-১	-২	-৪
রাজবাড়ী	+৩	+৪	+৩
মুন্সিগঞ্জ	-১	০	-১
গোপালগঞ্জ	+২	+৩	+২
মাদারীপুর	+১	+১	+১
মানিকগঞ্জ	+১	+২	+১
শরিয়তপুর	০	০	০

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	০	+১	-১
শেরপুর	+১	+৩	+১
জামালপুর	+২	+৩	+১
নেত্রকোনা	-১	০	-২

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-৬	-৬	-৫
কক্সবাজার	-৭	-৭	-৫
খাগড়াছড়ি	-৭	-৭	-৬
রাঙ্গামাটি	-৭	-৮	-৬
বান্দরবন	-৭	-৮	-৬
কুমিল্লা	-৩	-৩	-৩
নোয়াখালী	-৩	-৩	-৩
লক্ষীপুর	+৩	+৪	+৩
চাঁদপুর	-১	-১	-১
ফেনী	-৪	-৪	-৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-২	-৩

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৬	-৫	-৭
সুনামগঞ্জ	-৪	-৩	-৫
মৌলভীবাজার	-৬	-৫	-৬
হবিগঞ্জ	-৪	-৩	-৫

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৭	+৮	+৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৮	+৯	+৮
নাটোর	+৬	+৬	+৫
পাবনা	+৪	+৫	+৪
সিরাজগঞ্জ	+৩	+৪	+২
বগুড়া	+৪	+৫	+৩
নওগাঁ	+৬	+৭	+৫
জয়পুরহাট	+৫	+৭	+৫

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	+৪	+৬	+৩
দিনাজপুর	+৭	+৮	+৬
গাইবান্ধা	+৩	+৫	+৩
কুড়িগ্রাম	+৩	+৪	+২
লালমনিরহাট	+৪	+৫	+৩
নীলফামারী	+৬	+৮	+৫
পঞ্চগড়	+৭	+৯	+৬
ঠাকুরগাঁও	+৮	+৯	+৭

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৩	+৪	+৪
বাগেরহাট	+২	+২	+৩
সাতক্ষীরা	+৫	+৫	+৬
যশোর	+৫	+৫	+৫
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৭	+৬
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৬	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭
মাগুরা	+৪	+৪	+৪
নড়াইল	+৩	+৪	+৪

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	০	০	+১
পটুয়াখালী	০	০	+১
পিরোজপুর	+২	+৩	+২
ঝালকাঠি	+১	+১	+১
ভোলা	-১	-১	-১
বরগুনা	+১	+১	+২

৫ম বর্ষ
৫ম সংখ্যা
মার্চ - ২০২১
ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৭
রজব-শা'বান
১৪৪২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সার্বিক সম্পাদনায়

আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আল-ইতিছাম

- **প্রধান সম্পাদক,**
  আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী;
  তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
- **সম্পাদনা বিভাগ :** ০১৪০৭-০২১৮৩৮
- **ব্যবস্থাপনা বিভাগ :** ০১৪০৭-০২১৮৩৯
- **সার্কুলেশন বিভাগ :** ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪১
- **ই-মেইল :** monthlyalitisam@gmail.com
- **ওয়েবসাইট :** www.al-itisam.com
- **ফেসবুক পেজ :** facebook.com/alitisam2016
- **ইউটিউব :** youtube.com/c/alitisamtv

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

- **জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ :**
  ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮ , ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
- **জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী :**
  ০১৭৮৭-০২৫০৬০ , ০১৭২৪-৩৮৪৮৫৫
- **জামি'আহর উভয় শাখার জন্য :**
  ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ , ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬
- **জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে :**
  বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
  বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

২৫/- (পঁচিশ টাকা) মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
সাধারণ ডাক	২০০/-	৪০০/-
কুরিয়ার সার্ভিস	৩০০/-	৬০০/-

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **দারসে হাদীছ**
  - » একটি শিশুর সুষ্ঠু বিকাশ : পিতা-মাতার করণীয় ০৩
    -মুহাম্মাদ মুস্তফা কামাল
- **প্রবন্ধ**
  - » হজ্জ ও উমরা (পর্ব-৮) ০৫
    -আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
  - » বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার অতীত ও বর্তমান ০৮
    -ড. মো. কামরুজ্জামান
  - » আহলেহাদীছদের উপর মিথ্যা অপবাদ ও তার জবাব (পর্ব-৪) ১২
    -মূল (উর্দূ) : আবু যায়েদ যামীর
    অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান
  - » আসলেই কি সাত যমীনে সাত জন নবী? ১৫
    -আহমাদুল্লাহ
  - » শবে মি'রাজ পালন করা স্পষ্ট বিদআত ১৭
    -ওবায়দুল বারী
  - » কুরআন মাজীদে বর্ণিত শ্রেষ্ঠ প্রাণী পরিচিতি ২০
    -এস. এম. আব্দুর রঊফ
  - » যবান হেফাযতের গুরুত্ব ও ফযীলত ২৪
    -উসমান বিন আব্দুল আলিম
  - » মনীষীদের অন্তরে মৃত্যুভয় ২৭
    -আব্দুল বাছীর বিন আলম
- **হারামাইনের মিম্বার থেকে**
  - » প্রকৃত জ্ঞানীর বৈশিষ্ট্য ২৮
    -অনুবাদ : আব্দুল কাদের বিন রইসুদ্দীন
- **সাময়িক প্রসঙ্গ**
  - » জেলখানায় অপরাধ প্রবণতা : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রস্তাবনা ৩০
    -জুয়েল রানা
- **দিশারী**
  - » আমাদের রোল মডেল কে? ৩৪
    -জাবির হোসেন
- **শিক্ষার্থীদের পাতা**
  - » রাবী পরিচিতি-৫ : আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক্ব আল-ওয়াসিত্বী আল-কূফী রহিমাহুল্লাহ ৩৭
    -আল-ইতিছাম ডেস্ক
- **জামি'আহ পাতা**
  - » আসমান-যমীন কতদিনে সৃষ্টি এবং কোনটি আগে সৃষ্টি হয়েছে? ৩৮
    -আব্দুর রাযযাক বিন মাসির
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান** ৪০
- **কবিতা** ৪২
- **বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক** ৪৩
- **সওয়াল-জওয়াব** ৪৫

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

মসজিদভিত্তিক দ্বীন শিক্ষা চালু করুন

মসজিদ আল্লাহর ঘর *(আল-জিন, ৭২/১৮)* এবং তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় স্থান *(মুসলিম, হা/৬৭১)*। সেকারণে তা রাসূল ﷺ ও সকল নেককার মুমিনের নিকটও সর্বাধিক প্রিয় স্থান। ইসলামের সূচনা থেকেই মসজিদ শুধু ছালাত আদায়ের স্থান ছিল না, বরং এখানে সম্পাদিত হতো নানা ধরনের কর্মসূচী। নবী ﷺ এখানে বিভিন্ন বৈঠকের আয়োজন করতেন, প্রতিনিধি দলকে সংবর্ধনা জানাতেন। এখানেই চলত দারস-তাদরীসের কাজ। এখান থেকেই পরিচালিত হতো দাওয়াতী কার্যক্রম। বিভিন্ন এলাকায় প্রতিনিধি দল ও সৈন্যবাহিনী প্রেরণের কাজও হতো এখান থেকেই। এককথায় ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ সবকিছুই সম্পাদিত হতো মসজিদ থেকেই। সেজন্যই তো মদীনায় হিজরতের পর নবী ﷺ সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন, এমনকি নিজ বাসগৃহ নির্মাণের আগেই। এরই ধারাবাহিকতায় যুগ যুগ ধরে মসজিদভিত্তিক নানা কর্মসূচীর মধ্যে বিভিন্নমুখী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা হয়ে আসছিল, যা বহু দেশে এখনও বলবৎ থাকলেও আমাদের দেশে দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। কুরআন, হাদীছ, তাফসীর, ফিক্বহ, ফারায়েয, উছূলে ফিক্বহ, নাহু, ছরফ, বালাগাত, সাহিত্য ইত্যাদি মসজিদেই চর্চা হতো। সাথে সর্বোপরি শিষ্টাচার তো শিক্ষা দেওয়া হতোই। মসজিদভিত্তিক পড়ালেখা করেই বড় বড় আলেম-উলামা বের হতেন। বুঝা গেল, সমাজ সংস্কার ও আদর্শ প্রজন্ম গঠনে মসজিদের ভূমিকা অপরিসীম।

এদিকে এখন চলছে ওয়ায মাহফিলের মৌসুম। পুরো শীতকালজুড়েই দেশের গ্রাম-গঞ্জ-শহর সর্বত্র বিভিন্ন নামে আয়োজিত হয় এসব ওয়ায মাহফিল। জনগণের সার্বিক জীবনে এগুলোর প্রভাব অনেক। নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষায় এসব ইসলামী প্রোগ্রাম ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। কিন্তু বার্ষিক প্রোগ্রামের পেছনে যত খরচ ও শ্রম ব্যয় হয়, তার তুলনায় প্রভাব অনেক কম পড়ে। এর কারণ- (ক) হাতেগোনা কিছু মাহফিল ছাড়া বাকী সবগুলোতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিখাদ আলোচনা হয় না। (খ) একদিনের ওয়ায জনগণ সারা বছরের জন্য ধরে রাখতে পারে না; ভুলে যায়। (গ) এসব মাহফিলে ২/৪টা বিষয়ে আলোচনা হয় আর ইসলামের অন্যান্য দিক অধরাই থেকে যায়। (ঘ) এখানে সাধারণত নিত্য প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে কথা হয় না এবং হাতেকলমে শেখানোর তেমন কোনো বন্দোবস্তও থাকে না। (ঙ) অনেক সময় ইন্তেযামিয়া কমিটির নিয়্যতে যেমন খুলূছিয়াত থাকে না, তেমনি কখনও কখনও বক্তা বা আলোচকের নিয়্যতেও গড়বড় লক্ষ্য করা যায়। (চ) বিপুল সংখ্যক শ্রোতা বক্তব্য উপভোগ করতে যায়, উপকার নিতে যায় না। এসব কারণে এসব প্রোগ্রামের পূর্ণ বরকত ও প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না।

সেকারণে এসব বার্ষিক মাহফিলের পাশাপাশি মসজিদভিত্তিক কর্মসূচী অবশ্যই হাতে নিতে হবে। আর সেজন্য যা যা করতে হবে- (১) প্রতিটি মসজিদে মক্তব চালু করতে হবে, যেখানে কুরআন মাজীদের পাশাপাশি হাতের লেখা, দু'আ, আক্বীদা, আমল, শিষ্টাচার ইত্যাদি শেখা বাধ্যতামূলক থাকবে। সেজন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। ইমাম যোগ্য হলে তাকে দিয়েও মক্তবের কাজগুলো করিয়ে নেওয়া যাবে। (২) যে যে লাইনেই লেখাপড়া করুক না কেন, প্রতিটি ছেলে-মেয়েকে মক্তবে পাঠানো বাধ্যতামূলক করতে হবে। মেয়েদেরকে শিক্ষকের পরিবর্তে যোগ্য শিক্ষিকা দিয়ে পড়ানো বাঞ্ছনীয়। (৩) বড় ও বয়স্কদের দ্বীন শিক্ষার জন্য প্রতিটি মসজিদে যোগ্য ইমাম, খত্বীব ও দাঈ নিয়োগ দিতে হবে। যারা বিষয়ভিত্তিক তথ্যবহুল খুৎবা প্রদান করবেন। আক্বীদা ও আমল সম্পর্কিত বিভিন্ন বইয়ের উপর নিয়মিত দারস প্রদান করবেন। বিষয়ভিত্তিক সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক ওয়ায-নছীহত ও আলোচনার আয়োজন করবেন। মুছল্লীদের নিত্য প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল শেখাবেন এবং হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দিবেন। (৩) ইমাম ও খত্বীবগণের সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা ও সম্মান নিশ্চিত করতে হবে, যাতে এ সেক্টরে যোগ্য মানুষগুলো আসেন এবং তারা এখানে পূর্ণ মনোযোগী হতে পারেন। একদিনের মাহফিলে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তার কিয়দংশ এ মহান লক্ষ্যে ব্যয় করলেই তা সম্ভব ইনশা-আল্লাহ। (৪) মসজিদে বা বাইরের ওয়ায মাহফিলে জনগণকে সালাফে ছালেহীনের বুঝনির্ভর কুরআন-হাদীছের বিশুদ্ধ জ্ঞান দিতে হবে; অন্য সবকিছু নিষিদ্ধ ও বর্জন করতে হবে। এসব বাস্তবায়ন করা গেলে প্রতিটি মসজিদ হয়ে উঠবে এক একটি বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং দেশের সর্বস্তরের জনগণ পাবে দ্বীনের আলো। গড়ে উঠবে একটি আদর্শ ও তাক্বওয়াবান প্রজন্ম, যারা বড় হয়ে ডাক্তার, প্রকৌশলী যা-ই হোক কেন আমানতদারিতার সাথে দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করে যেতে পারবে। গড়ে উঠবে শান্তিময় পরিবার, সমাজ থেকে দূর হবে নানা অন্যায়-অনাচার।

মহান আল্লাহ তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

একটি শিশুর সুষ্ঠু বিকাশ : পিতা-মাতার করণীয়

-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল*

عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

সরল বাংলা অনুবাদ :

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘প্রতিটি শিশুই ফিত্বরাত তথা ইসলামী আদর্শের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানিয়ে দেয়’।[১]

শব্দ বিশ্লেষণ :

كُلُّ - প্রত্যেক, সকল, مَوْلُودٍ - সদ্যজাত সন্তান, নবজাতক, يُولَدُ - জন্মগ্রহণ করে, عَلَى - উপরে, الفِطْرَةِ - ফিত্বরাত, স্বভাব, সৃষ্টিগত আচরণ, فَ - অতঃপর, أَبَوَاهُ - দ্বিবচন এর শব্দ, অর্থ- পিতামাতা, هُ - তার বা তাকে يُهَوِّدَانِهِ -ইয়াহূদী বানায়, يُنَصِّرَانِهِ - তাকে খ্রিষ্টান বানায়, يُمَجِّسَانِهِ - অগ্নিপূজক বানায়।

ব্যাখ্যা :

আল্লাহ তাআলার প্রত্যেকটি কাজ বিজ্ঞানভিত্তিক, যুক্তিনির্ভর এবং শিক্ষণীয়। মানুষের জীবন পদ্ধতি কেমন হবে, কোন পন্থা অবলম্বন করলে তার জীবন আরও সুন্দর ও সার্থক হবে সে সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত *(আল-বাক্বারা, ২/২৯)*।

মানব জাতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা অত্যন্ত জটিল ও বিস্ময়কর। একজন শিশুকে কীভাবে গড়ে তুলতে হবে বা এক্ষেত্রে তার পিতা-মাতার ভূমিকা কেমন হবে তার সুস্পষ্ট বর্ণনা আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে একটি শিশুর বিকাশ অত্যন্ত সূক্ষ্ম, যৌক্তিক, কল্যাণকর ও স্বার্থক হবে সে সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে পিতা-মাতাকে অবহিত করা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমার পরিবার থেকে শিষ্টাচার শেখানো থেকে কখনও বিরত হবে না আর তাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ভয় দেখাও’।[২]

জন্মগতভাবে একটি মানব শিশু সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ ও পরিচ্ছন্ন আত্মা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু জিন ও মানব শয়তানের আছর বা অন্য কোনো ভ্রষ্টতা দ্বারা প্রভাবিত হলে এর ব্যত্যয় ঘটে। আল্লামা ইবনু আছির তার নেহায়া গ্রন্থে বলেছেন, ‘আল্লাহর অমোঘ নিয়মানুসারে সে একটি আদর্শিক অবস্থার উপর এবং স্বভাবগতভাবেই সত্য দ্বীন গ্রহণে উপযোগী হয়ে জন্মগ্রহণ করে’।[৩]

কিন্তু তার শারীরিক ও মানুষিক বিকাশ পরিবেশ ও অবস্থার উপর নির্ভরশীল। পিতা-মাতার আচার-আচরণ, পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক অবস্থা এ ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তার শারীরিক ও মানুষিক বিকাশে পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক কৃষ্টি-কালচার ও আচার-অনুষ্ঠান ব্যাপক প্রভাব ফেলে। সে ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান, অগ্নি অথবা অন্য কোনো জড়পদার্থের পূজা করে।

পিতা-মাতার বিশ্বাস, আদর্শ, সামাজিক পরিবেশ ও অবস্থার আলোকে তার মানসিকতা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আত্মবিশ্বাস, চেতনাবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে।

এর ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম তার শিফাউল আলীল গ্রন্থে বলেছেন, প্রতিটি শিশুর ইসলামী আদর্শ ও ধর্মীয় চেতনার উপর জন্মগ্রহণ করার অর্থ এটা নয় যে, সে জন্মের সময় ইসলাম সম্পর্কে জানত বা ইসলামকে পছন্দ করত। কারণ আল্লাহ বলেন, ‘তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে বের করেছেন যখন তোমরা কিছুই জানতে না *(আন-নহল, ১৬/৭৮)*।[৪] তবে হ্যাঁ, তার স্বভাব ইতিবাচক এবং ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী হওয়া স্বাভাবিক।

অতএব, ফিত্বরাতের প্রকৃতি হলো, তার মধ্যে স্রষ্টার স্বীকৃতি, ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ও একনিষ্ঠতা বিরাজ করা। পারিপার্শ্বিক বিরূপ প্রভাব থেকে মুক্ত একটি শিশুর হৃদয়ে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ ধারা তার মনে অব্যাহত থাকে। কিন্তু পরিবেশের প্রভাবে সে ভুল পথে পরিচালিত হলে এ কথা বলা যাবে না যে, সে নির্দোষ বা নিষ্পাপ। তার নিকট আল্লাহর আদেশ বা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপদেশ এসেছিল কিন্তু সে পারিপার্শ্বিক প্রভাবের কারণে গ্রহণ

* প্রভাষক, বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বরিশাল।

১. ছহীহ বুখারী, হা/১৩৫৮; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৫৮; মিশকাত, হা/৯০।
২. ইমাম বুখারী, আদাবুল মুফরাদ, হা/২০।
৩. ইবনুল আছির, কিতাবুন নেহায়া, ৩/১৫৭।
৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, শিফাউল আলীল, পৃ. ২৮৩।

করতে পারেনি বিধায় তার শাস্তি হওয়া উচিত নয় এমন বিশ্বাস পোষণ করা সঠিক হবে না।

মোটকথা প্রত্যেক শিশুই ইসলামী স্বভাব এবং আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণের মানসিকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। যদি সে প্রতিবন্ধকতা মুক্ত থাকে, তবে সে ইসলামবিমুখ হবে না। যেমনভাবে সে শরীর সহায়ক খাদ্যের প্রতি আসক্ত হয় জন্ম থেকেই। পাপপ্রবণতা মানবাত্মার অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয় মানুষের আত্মা মন্দ কর্মপ্রবণ' *(ইউসুফ, ১২/৫৩)*।

মানুষের আত্মা বা রূহ এমন একটি বিষয়, যার নষ্ট হওয়া, কালিমাযুক্ত হওয়ার প্রভাব অত্যন্ত ভয়াবহ, মারাত্মক বিপর্যয়কর এবং ভয়ংকর ধ্বংসাত্মক। মানবাত্মার বিকাশ না ঘটার কারণে মানব সভ্যতার বিপর্যয় ঘটতে পারে। চরম বিশৃঙ্খলা হতে পারে, সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে। এমন পরিবেশ পূর্বে ঘটেছিল, যার কারণে এই পৃথিবী থেকে বহু জাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যেমন ছালেহ আলাইহিস সালাম-এর সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'ভয়ংকর গর্জন পাপিষ্ঠদের পাকড়াও করল, ফলে ভোর হতে না হতেই তারা নিজ নিজ গৃহসমূহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল' *(হূদ, ১১/৬৭)*।

কঠোর অধ্যবসায়, চরম সাধনা এবং ইস্পাতসম দৃঢ় মনোবল নিয়ে শিশুর যত্ন ও পরিচর্যা করতে হবে। এর অব্যাহত উন্নয়ন ও ক্রমাগত উৎকর্ষ সাধনে আত্ম নিয়োগ করতে হবে। একে উৎকর্ষের চরম সীমানায় পৌঁছানোর জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রকৃত যোদ্ধা তো সেই ব্যক্তি, যে নিজের আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে'।[৫]

উল্লিখিত আলোচনার আলোকে প্রত্যেক নবজাতককে পারিপার্শ্বিক, সামাজিক বিরূপ প্রভাব থেকে মুক্ত করে ইসলামী আদর্শের আলোকে গড়ে ওঠার সুযোগ করে দিন। মুসলিম সমাজে গড়ে ওঠা কোনো শিশু যেন পিতা-মাতা বা সামাজিক অথবা বিজাতীয় প্রভাবে বিপথগামী না হয় সেই ব্যবস্থা আল্লাহ সকল শিশুর জন্য করুন- আমীন!

---

৫. তিরমিযী, হা/১৬২১।

আনাস হোমিও চিকিৎসালয়

আনাস হিজামা কেয়ার

(একটি প্রাচীন ও সুন্নতি চিকিৎসা পদ্ধতি)

রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমরা যে সব পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাও হিজামা সে সবের মধ্যে উত্তম ব্যবস্থা অথবা এটি তোমাদের ঔষধের মধ্যে অধিক ফলদায়ক।" (সহীহ্ মুসলিম-৩৯৩০)

রোগের নামসমূহ

- মাথা ব্যাথা
- কোমড় ব্যাথা
- হাটু ব্যাথা
- পায়ের গোড়ালি ব্যাথা
- আঘাতজনিত ব্যাথা
- ব্রেইন স্ট্রোক
- উচ্চ রক্তচাপ
- বাতের ব্যাথা
- ঘাড়ে ব্যাথা
- ঘন ঘন প্রস্রাব
- ঘুমের ব্যঘাত
- অর্শ
- অন্ডকোষ ফোলা
- পাঁচড়া/ফোঁড়া
- তুকের বর্জ্য পরিস্কার
- ঘাড়ে ব্যাথা
- জয়েন্টে পেইন
- গ্যাসটিক

বি: দ্রঃ প্যারালাইসিস ও ব্রেইন স্ট্রোকের জন্য হিজামা থেরাপি সর্বোত্তম চিকিৎসা পদ্ধতি।

এখানে পুরাতন ও জটিল রোগের চিকিৎসা করা হয়।

অপারেশন ছাড়ায় টিউমার ও নাকের পলিপাসের চিকিৎসা প্রদান করা হয়

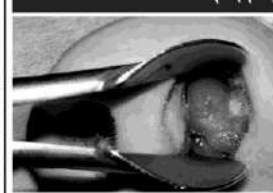

এছাড়াও এলার্জি, শ্বাসকষ্ট, চর্ম ও যৌন, পাইল্‌স, পুরাতন আমাশয়, গ্যাস্টিক, মহিলাদের অতিরিক্ত ঋতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব, জন্ডিস, প্যারালাইসিস ও ব্রেইন স্ট্রোকসহ আরও জটিল রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আনাস হোমিও চিকিৎসালয়
মোবাইল নং : ০১৭৩৮ ১৮২১৪৪
০১৯২৫ ৩৯২১৮১

আমচত্তর, মহিলা মাদ্রাসা থেকে ১৫০ গজ পশ্চিমে, নওদাপাড়া, রাজশাহী। (প্রতি শুক্রবার)

হুজরীপাড়া, আনসার হাজীর মোড়, কর্ণহার, রাজশাহী। (শনি-বৃহ: সন্ধা ০৬:০০-রাত ০৯:০০

হজ্জ ও উমরা

-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

(পর্ব-৮)

হজ্জ ও উমরার ওয়াজিবসমূহ :

হজ্জ কিংবা উমরায় যে সকল আমল সম্পাদন করা জরুরী, কিন্তু ছুটে গেলে হজ্জ-উমরা বাতিল হয়ে যায় না, তবে জরিমানা স্বরূপ কাফফারা দিতে হয়, সে সকল আমলকে হজ্জ-উমরার ওয়াজিব বলা হয়। ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরার জরুরী আমল ভুলে গেছে অথবা ছেড়ে দিয়েছে, সে যেন রক্ত প্রবাহিত করে।[১] অর্থাৎ পশু যবেহ করে।

হজ্জের ওয়াজিবসমূহ :

হজ্জের ওয়াজিব আটটি। যথা :

১. নির্ধারিত মীক্বাত হতে ইহরাম বাঁধা।
২. সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার মাঠে অবস্থান করা।
৩. মুযদালিফায় রাত্রিযাপন করা।
৪. ১০ তারিখে বড় জামরায় ৭টি এবং ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে ছোট জামরা, মধ্য জামরা ও বড় জামরায় প্রতিদিন মোট ২১টি পাথর মারা।
৫. কুরবানী করা।
৬. মাথা ন্যাড়া অথবা চুল ছোট করা।
৭. ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ মিনায় রাত্রিযাপন করা।
৮. বিদায় ত্বাওয়াফ করা।

ওয়াজিবসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

নির্ধারিত মীক্বাত হতে ইহরাম বাঁধা : হজ্জ ও উমরার জন্য ইহরাম বাঁধা ফরয। যারা যে মীক্বাত অতিক্রম করে বায়তুল্লাহয় প্রবেশ, তারা সে মীক্বাত হতে ইহরাম বাঁধবে। আর মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَقَّتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ: الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّه مِنْ أَهْلِه وَكَذَاكَ وَكَذَاكَ حَتَّى اَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا.

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদীনাবাসীদের জন্য ‘যুল হুলায়ফাহ’ শাম বা সিরিয়াবাসীদের জন্য, ‘জুহফাহ’ নাজদবাসীদের জন্য, ‘ক্বরনুল মানাযিল’ এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য ‘ইয়ালামলাম’-কে মীক্বাত নির্দিষ্ট করেছেন। এ সকল স্থানে বসবাসরত জনগণ আর যারা এ স্থান অতিক্রম করে হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহয় প্রবেশ করবে তাদের জন্য মিকাত এ সকল স্থান। আর যারা মীক্বাতের সীমার মধ্যে অবস্থান করবে, তাদের ইহরামের স্থান তাদের ঘর। এভাবে পর্যায়ক্রমে নিকটবর্তী লোকেরা স্বীয় বাড়ি হতে এমনকি মাক্কাবাসীরা ইহরাম বাঁধবে মক্কা হতেই।[২] এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইহরাম বাঁধার জন্য নির্ধারিত স্থান রয়েছে। নির্ধারিত স্থানে ইহরাম বাঁধতে না পারলে পুনরায় মীক্বাতে ফিরে গিয়ে ইহরাম বাঁধতে হবে। সম্ভব না হলে জরিমানা হিসাবে দম দিতে হবে।

সূর্য ডুবা পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা : হজ্জের দিন আরাফার মাঠে অবস্থান করা ফরয। আর সূর্য ডুবা পর্যন্ত অবস্থান করা ওয়াজিব। জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার দিন আরাফার মাঠে যোহর ও আছর এক সাথে আদায় করলেন এবং ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দু‘আ করতে লাগলেন এমনকি সূর্য ডুবে গেল।[৩] এই হাদীছে প্রমাণিত হয়, তিনি নিজেই সূর্যস্ত পর্যন্ত আরাফার মাঠে অবস্থান করেছেন। আর তিনি আমাদেরকে বলেছেন, তোমরা তোমাদের হজ্জের নিয়ম-কানুন আমার নিকট হতে গ্রহণ করো। জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে আদেশ করেন, তোমরা তোমাদের হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও। আমার মনে হচ্ছে, আমি এবার হজ্জ করার পর আর হজ্জ করার সুযোগ পাব না।[৪] অতএব সূর্য ডুবা পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করতে হবে। সূর্য ডুবার আগেই আরাফা ত্যাগ করলে দম দেওয়া জরুরী হয়ে পড়বে।

মুযদালিফায় অবস্থান করা : আল্লাহ তাআলা আদেশ করেন, فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ‘যখন তোমরা আরাফা হতে মাশআরে হারামে বা মুযদালিফায় ফিরে আসবে,

১. মুওয়াত্ত্বা মালেক, ১/৪১৯।
২. ছহীহ বুখারী, হা/১৫২৬; মিশকাত, হা/১১৮১
৩. ছহীহ মুসলিম, হা/১২১৮; মিশকাত, হা/২৫৫৫।
৪. ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৯০।

তখন তোমরা আল্লাহর যিকির করো' *(আল-বাক্বারা, ২/১৯৮)*। এই আয়াত প্রমাণ করে, মুযদালিফায় অবস্থান করতে হবে। তারপর তিনি আরাফার ময়দান হতে মুযদালিফায় চলে আসলেন। তিনি সেখানে এক আযানে এবং দুই ইক্বামতে মাগরিব ও এশার ছালাত আদায় করলেন। তিনি দুই ছালাতের মাঝে কোনো সুন্নাত পড়লেন না। তারপর তিনি বাহনে আরোহণ করে মাশআরে হারামে তথা মুযদালিফায় আসলেন। ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন, তাকবীর পাঠ করলেন, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললেন এবং আল্লাহর একত্বের বর্ণনা করলেন। তিনি এভাবে দাঁড়িয়ে দু'আ করতে থাকলেন, এমনকি পূর্ব আকাশ খুব বেশি উজ্জ্বল হয়ে গেল।[৫] এই হাদীছ প্রমাণ করে, নবী করীম ﷺ নিজে মুযদালিফায় রাত্রিযাপন করেছেন। সুস্থ পুরুষ-নারী মুযদালিফায় রাত্রি যাপন না করলে তার উপর দম দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। তবে অসুস্থ মহিলা এবং ছোট বাচ্চারা প্রয়োজন মনে করলে অর্ধরাতের পর মুযদালিফা ত্যাগ করতে পারে; তারা বাকি সময় মিনায় থাকতে পারে।

১০ তারিখে বড় জামরায় এবং ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে তিন জামরায় পাথর নিক্ষেপ করা : ১০ তারিখে শুধু বড় জামরায় সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭টি পাথর মারতে হবে এবং ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে সূর্য ঢলার পর হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ে তিনটি স্থানে ২১টি পাথর মারতে হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ رَمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ কুরবানীর দিন বড় জামরায় পাথর মারেন। আর পরের দিনগুলোতে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর পাথর মারেন।[৬] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا رَمَى الَّذِيْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি জামরাতুল কুবরার (বড় জামরার) নিকট পৌঁছে বায়তুল্লাহকে বামে আর মিনাকে ডানে রেখে এর উপর সাতটি পাথর মারলেন, এতে প্রত্যেকবার 'আল্লাহু আকবার' বলেছেন। অতঃপর তিনি বললেন, যার ওপর সূরা আল-বাক্বারা নাযিল হয়েছে, তিনি ﷺ ও এভাবে পাথর মেরেছেন।[৭] এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম ﷺ ১০ তারিখ সকালে পাথর মারতেন, আর পরের দিনগুলোতে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর পাথর মারতেন।

عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهِ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا.

ওয়াবারা রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কোন দিন পাথর মারব? তিনি বললেন, তোমার ইমাম যেদিন মারবে, তুমিও সেদিন পাথর মারবে। আবার আমি তাকে এ মাসআলাটি জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, আমরা সময়ের অপেক্ষায় থাকতাম, যখন সূর্য অস্ত যেত তখন আমরা পাথর মারতাম।[৮] অতএব পরের দিনগুলোতে সূর্য ঢলার আগে পাথর মারলে ওয়াজিব পালন হবে না। ফলে পুনরায় সঠিক সময়ে মারতে হবে; নতুবা দম দিতে হবে। তবে কেউ যদি পাথর মারতে অক্ষম হয়, তাহলে তার পক্ষ হতে অন্যজন পাথর মারতে পারে।

হাদী কুরবানী দেওয়া : ১০ তারিখের দ্বিতীয় কাজ হলো হাদী (কুরবাণীর পশু)ক যবেহ করা। হাদীর উত্তম পশু হলো উট, তারপর গরু, তারপর ছাগল বা দুম্বা। আর একটি গরুতে কিংবা উটে সাতজন হাজী অংশগ্রহণ করা জায়েয আছে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجُزُوْرُ عَنْ سَبْعَةٍ

জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'একটি উট সাতজনের পক্ষ হতে এবং একটি গরু সাতজনের পক্ষ থেকে (কুরবানী) করা বৈধ হবে'।[৯]

পশু যবেহ করার স্থান : সম্পূর্ণ মিনা ও মক্কার প্রতিটি পথ পশু যবেহ করার স্থান। জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ 'মিনা সম্পূর্ণটাই কুরবানীর স্থান। মক্কার প্রতিটি পথ মানুষ চলাচলের জন্য এবং কুরবানী করার

৫. ছহীহ মুসলিম, হা/১২১৮; মিশকাত, হা/২৫৫৫।
৬. ছহীহ মুসলিম, হা/১২৯৯; নাসাঈ, হা/৩০৬৩; মিশকাত, হা/২৬২০।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/১৭৪৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১২৯৬; আবূ দাউদ, হা/১৯৭৪; মিশকাত, হা/২৬২১।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/১৭৪৬; আবূ দাউদ, হা/১৯৭২; মিশকাত, হা/২৬৬০।
৯. ছহীহ মুসলিম, হা/১৩১৮; আবূদাউদ, হা/২৮০৭; মিশকাত, হা/১৪৫৮।

জন্য। পূর্ণ আরাফা অবস্থানের জন্য এবং পূর্ণ মুযদালিফা অবস্থানের জন্য।[১০] এই হাদীছ প্রমাণ করে, মিনা এবং মক্কার মানুষ চলাচলের সকল পথগুলো কুরবানী করার স্থান।

হাদী ও কুরবানীর সময়সীমা : হাদী ও কুরবানীর সময়সীমা চার দিন। ১০ তারিখে এবং ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে কুরবানী করা যায়। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ 'তাশরীকের দিনগুলোতে ছিয়াম পালনের অনুমতি দেননি। তবে যারা কুরবানীর পশু সংগ্রহ করতে পারেননি (তারা ছিয়াম থাকতে পারে)'।[১১] এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ১০ তারিখের পরে ১১, ১২ ও ১৩ তারিখও কুরবানী করার দিন।

নুবাইশা হুযালী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 'তাশরীকের দিনগুলো খাওয়া, পান করা এবং আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য'।[১২] এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ১০ তারিখের পরের দিনগুলো খাওয়া ও পান করার জন্য।

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ 'তাশরীকের সকল দিন হচ্ছে পশু যবেহ করার দিন'।[১৩] এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাশরীকের দিনগুলো পশু যবেহ করার দিন, তা মোট চার দিন হয়।

১১, ১২ ও ১৩ তারিখের রাতগুলো মিনায় থাকা : এই রাতগুলো মিনায় যাপন করা ওয়াজিব। কেউ যদি ১২ তারিখ পাথর নিক্ষেপ করে চলে আসতে চায়, তাহলে ১০ ও ১১ তারিখ দিবাগত রাত মিনায় যাপন করতে হবে। কারণ নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুধু রাখাল ও পানি পানের দায়িত্বশীলদের বলেছেন, তাদের মিনায় রাত্রি যাপন করা লাগবে না। এছাড়া অন্য কাউকে তিনি অনুমতি দেননি। হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ.

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে হাজীদের পানি পান করানোর জন্য মিনার রাত্রিগুলো মক্কায় থাকার জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন। ফলে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন।[১৪] এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মিনার রাত্রিগুলো মিনায় থাকতে হবে, নতুবা দম দিতে হবে।

বিদায় ত্বাওয়াফ করা : হজ্জের সর্বশেষ কাজ হলো, বিদায় ত্বাওয়াফ করা। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ 'আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, যাদেরকে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুর্বলতার কারণে মুযদালিফা হতে (মিনায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন)'।[১৫]

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ كُلَّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ 'হজ্জ শেষে মানুষ বিভিন্ন পথে ফিরে যেতে লাগল, তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কা'বায় সর্বশেষ ত্বাওয়াফ না করে কেউ যেন বিদায় না হয়'।[১৬] এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিদায় ত্বাওয়াফ হতে হবে, যা ওয়াজিব।

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ 'রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষ বিদায় ত্বাওয়াফ না করে যেতে নিষেধ করেছেন'।[১৭] এই হাদীছ প্রমাণ করে, বিদায় ত্বাওয়াফ করতে হবে। অতএব, বিদায় ত্বাওয়াফ না করলে দম দিতে হবে। মক্কা হতে দেশে ফেরার পূর্বে বিদায় ত্বাওয়াফ এবং দুই রাকআত ছালাত আদায় করতে হবে। অবশ্য এ হুকুম ঋতুবতী মহিলাদের জন্য নয়। বিদায় হওয়ার সময় যদি কোনো মহিলা ঋতুবতী হয়, তাহলে তাকে বিদায় ত্বাওয়াফ করতে হবে না। ইবনু ইব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ 'মানুষকে আদেশ করা হয়েছিল এ মর্মে যে, তাদের শেষ বিদায় হবে বায়তুল্লাহ ত্বাওয়াফের মাধ্যমে। তবে ঋতুবতীদের প্রতি বিষয়টি হালকা করা হয়েছে'।[১৮]

(চলবে)

---

১০. ইবনু মাজাহ, হা/৩০৪৮; সিলসিলা ছহীহ, হা/২৪৬৪।
১১. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৯৮।
১২. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৪১; মিশকাত, হা/২০৫০।
১৩. মুসনাদে আহমাদ, হা/১৬৭৯৭; সিলসিলা ছহীহা, হা/২৪৭৬।
১৪. ছহীহ বুখারী, হা/১৬৩৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩১৫; মিশকাত, হা/২৬৬২।
১৫. ছহীহ বুখারী, হা/১৬৭৮; নাসাঈ, হা/৩০৩২; মিশকাত, হা/২৬০৯।
১৬. ইবনু মাজাহ, হা/৩০৭০; ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/৩০০০।
১৭. ছহীহ মুসলিম, হা/১৩২৭; ইবনু মাজাহ, হা/৩০৭১; মিশকাত, হা/২৬৬৮।
১৮. ছহীহ বুখারী, হা/১৭৫৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩২৮; ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/২৯৯৯।

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার অতীত ও বর্তমান

-ড. মো. কামরুজ্জামান*

‘আমাদের এই উপমহাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়েছিল মাদ্রাসা শিক্ষা দিয়ে। অনেকেই অনেক কিছু মনে করতে পারেন। তবে আমি মনে করি, ধর্মীয় অনুভূতির বাইরে আমরা কেউ না। আমরা ধর্মকে অস্বীকার করতে পারি না। আবার ধর্মের অপব্যবহার হোক এটাও আমরা চাই না। জীবন-জীবিকার শিক্ষার পাশাপাশি যখনই আমরা ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি তখনই শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয়। আমি মাদরাসা শিক্ষার বিষয়ে বলব, এখানে লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে লেখাপড়া করে। দেশের অনেক গরীব ও এতিম সন্তানের ঠাঁই এখানেই হয়। কিন্তু তাদের শিক্ষার কোন সরকারি স্বীকৃতি ছিল না। তাদের শিক্ষা কার্যক্রম তাদের মতো করেই চলত । আমি চেষ্টা করেছি এর একটা সমাধান করতে। তাদের জন্য আজকে এর (কওমি মাদরাসার) স্বীকৃতি দিয়েছি। এখন কেউ যদি আমার জন্য দোয়া করে বা আমাকে ভালো বলে তাহলে তো দেশের মানুষের খুশি হওয়ার কথা। যারা আমার সত্যিকারের ভালো চায় না, যারা আমাকে খুন করার চেষ্টা করছে, তারা হয়তো মনে কষ্ট পাবে, অখুশি হবে। কিন্তু দেশের মানুষ এর (কওমি মাদরাসার স্বীকৃতির) কারণে খুশি হয়েছে। এখন আমার অনুভূতি এতোটুকুই; যারা কওমি মাদরাসার শিক্ষা গ্রহণ করতো তাদের ভবিষ্যতের একটা ঠিকানা করে দিতে পেরেছি সেটাই আমার বড় সেটিসফেকশন (তৃপ্তি)’।

উল্লেখিত বক্তব্যটি বাংলাদেশের চারবারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার।[১] মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ অক্টোবর ২০১৮ সালে গণভবনে আয়োজিত ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলনে উল্লেখিত বক্তব্যটি প্রদান করেন। অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে। ‘এই উপমহাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার সূচনা হয়েছে মাদরাসা শিক্ষা দিয়ে’ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যপূর্ণ ও বিশ্লেষণাত্মক। কারণ বিষয়টি ধর্মপ্রাণ অনেক বাঙালিরই অজানা। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জানার জন্য প্রাচীন বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা প্রয়োজন বোধ করছি। বিষয়টির নিরপেক্ষ অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, প্রাচীন বাংলায় শিক্ষাব্যবস্থা খুব একটা সংগঠিত ছিল না। আজ থেকে ৩০০০ বছর আগের যুগটি ছিল বৈদিক যুগ। ঐতিহাসিকদের মতে, এ সময় লেখাপড়ার কোনো সংগঠিত রূপ ছিল না। এ যুগে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের নিমিত্তে শুধু মন্দিরকেন্দ্রিক লেখাপড়া চালু ছিল। আর এ যুগের ঠিক ৫০০ বছর পরে শুরু হয় ব্রহ্মণ যুগ। আদি মানুষের আত্মা, জন্ম আর মৃত্যু পরিচালননিয়ম জানাই ছিল এ শিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু এ শিক্ষা সার্বজনীন ছিল না। শুধু ব্রাহ্মণ পরিবারের শিশুরাই এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। এর বাইরে নিম্নবর্ণের কোনো গোত্র লেখাপড়া করার অধিকার রাখত না। এ যুগ শেষ হলে শুরু হয় বৌদ্ধশিক্ষার যুগ। এ যুগের সূচনা খ্রিষ্টপূর্ব ৬ শতকে। এ শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মঠকেন্দ্রিক। শুধু মাঠকেন্দ্রিক থাকার কারণে এ শিক্ষাব্যবস্থার সার্বজনীনতাও ছিল না। এভাবেই মন্দিরকেন্দ্রিক, মাঠকেন্দ্রিক এবং পরিবার ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক লেখাপড়া ছিল প্রাচীন বাংলার বাস্তব চিত্র। ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে আরবে আগমন ঘটে মহানবী ﷺ-এর। এ যুগকে মধ্যযুগ বলা হয়। এ যুগে মহানবী ﷺ আনীত ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার এক মহাবিপ্লব ঘটে।

নবী ﷺ-এর ছাহাবীগণ শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের নিমিত্তে ছড়িয়ে পড়েন বিভিন্ন দেশে। ৭১১ সালে ভারতবর্ষে আগমন ঘটে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের। তিনি রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি শিক্ষা বিস্তারের দিকে বিশেষ নযর দেন। মক্তব ও মসজিদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে শিশু শিক্ষার প্রবর্তন করেন। এ মক্তব ও মসজিদে মুসলিম শিশুর পাশাপাশি হিন্দু শিশুরাও শিক্ষাগ্রহণ করতো। এ সময় থেকেই এ দেশে শিক্ষাব্যবস্থার একটি ধারা সৃষ্টি হয়। আর এ শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তব সুগঠিত রূপ পায় সুলতানি আমলে (১২১০-১২৭৬)। fateh24.com সূত্রমতে, এ আমলে প্রতিটি ধনী বাড়ির সামনে মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এসব মক্তবে আরবী ও ফার্সি পাঠদানের পাশাপাশি হস্তলিপিও শেখানো হতো। হিন্দু শিশুরাও এসব মক্তবে পড়াশোনা করতো। বাংলার শাসকগণ প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়েও অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। এ উপলক্ষ্যে শাসকগণ প্রচুর লা খেরাজ (নিষ্কর) জমি দান করে দিতেন। নওগাঁর মহিসন্তোষ তকিউদ্দিন আরাবী

* অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১. দৈনিক যুগান্তর, ৪ অক্টোবর, ২০১৮।

প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার জন্য বরাদ্দকৃত জমিই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ প্রতিষ্ঠানের জন্য দানকৃত জমির পরিমাণ ছিল ২৭০০ একর। রাজশাহী জেলার বাঘাতে মাদরাসার জন্য দান করা জমির পরিমাণ ছিল ৪২টি গ্রাম। এসব মাদরাসায় শিক্ষার্থীরা বিনা খরচে লেখাপড়া করতো। ১২৭৮ সালে শারফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা কর্তৃক সোনারগাঁয়ে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাটি ছিল বাংলার সবচেয়ে বড় মাদরাসা। এ সময় মাদরাসার পাঠ্যসূচিতে ছিল আরবী, নাহু, ছরফ, বালাগাত, মানতিক, কালাম, তাছাউফ, সাহিত্য, ফিক্বহ, দর্শন ইত্যাদি। মোগল আমলে (১৫২৬ থেকে ১৮৫৭ সালে) বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার এ পাঠ্যসূচির সাথে সংযুক্তি ঘটে। জীববিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল, কৃষি, লোকপ্রশাসন, চারুকলা ইত্যাদি জ্ঞানের এ শাখাগুলো মাদরাসাশিক্ষার সাথে সংযুক্ত হয়। এভাবেই প্রাচীনকালে মাদরাসাশিক্ষার মাধ্যমে উপমহাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার সোনালি অধ্যায়ের যাত্রা শুরু হয়।

কিন্তু ইংরেজ আমলে (১৭৫৭-১৯৪৭) পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর দুর্ভাগ্যজনকভাবে মাদরাসাশিক্ষার পথ সংকুচিত হতে থাকে। শুরু হয় ইংরেজ শাসন। এ সময় ইংরেজরা মাদরাসার নামে বরাদ্দকৃত জমি বাজেয়াপ্ত করতে থাকে। তাদের প্রায় ২০০ বছরের শাসনামলে ৮০,০০০ মাদরাসার মধ্যে ৭৮,০০০ মাদরাসা বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে উপমহাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার গতি রুদ্ধ হতে থাকে। কিন্তু বাংলার ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ নিজের বাড়িতে, পাড়ায় ও মহল্লায় মক্তব, মসজিদ নির্মাণপূর্বক মাদরাসাশিক্ষার ধারা অব্যাহত রাখেন। দেশের ধর্মপ্রাণ জনতা ও আলেম সমাজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কারণে ইংরেজ শাসকদের ষড়যন্ত্র শতভাগ সফল হয়নি। ইংরেজগণ অবশ্য কিছু মুসলিম আইন অফিসার তৈরির জন্য ১৭৮০ সালে উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠা করেন কলকাতা আলিয়া মাদরাসা। আর আলেম সমাজের উদ্যোগে ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় দেওবন্দের সুবিখ্যাত ক্বওমী মাদরাসা। এ দুই ধারার মাদরাসা উপমহাদেশে সফল ও সমান্তরালভাবে চলতে থাকে । এ দুই ধারার বাইরে আরেকটি শিক্ষা ব্যবস্থার ধারণা জন্ম নেয় ১৯১৪ সালে। এ সালে মোহামেডান এডুকেশন এ্যাডভাইজারি কমিটি কর্তৃক বাংলাদেশে নিউ স্কিম ও ওল্ড স্কিম নামে দু'ধরনের মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার ধারণা জন্মে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে বাংলাদেশে মুসলিমদের জন্য বিশেষায়িত স্কুল ও কলেজের যাত্রা শুরু হয়। এসব স্কুল ও কলেজে আরবী শিক্ষা, ইসলামী শিক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। বাংলাদেশের বিশিষ্ট মুসলিম নেতাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনটি অনুষদ আর বারোটি বিভাগ নিয়ে যাত্রা শুরু করে এ বিশ্ববিদ্যালয়। এ বারোটি বিভাগের মধ্যে ইসলামিক স্টাডিজ এবং আরবী ছিল স্বতন্ত্র দুটি বিভাগ। এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলায় শিক্ষাব্যবস্থার যাত্রা দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায়। শেরে বাংলা একে ফজলুল হক (তৎকালীন খণ্ডকালীন) শিক্ষামন্ত্রী মুসলিম শিক্ষার্থীদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার স্বার্থে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ ও বরিশালের চাখার কলেজসহ অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। আর এসব প্রতিষ্ঠানে ইসলামী শিক্ষা পড়া ছিল বাধ্যতামূলক। মূলত মুসলিম নেতারা মুসলিমদের অতীত ধর্মীয় শিক্ষার স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও জ্ঞানপিপাসার তৃপ্তি মেটাতে মসজিদ-মাদরাসার বাইরে ইসলামী শিক্ষার শুভ সূচনা ঘটান। এতে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে ইসলাম শিক্ষিত আলেম-ওলামার কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হয়। ১৯৪৭ সালে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা ঢাকায় স্থানান্তির হয়। ১৯৫৮ সালে ১১ই মার্চ তদানীন্তন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান মাদরাসার জন্য ঢাকার বকশীবাজারে চারতলাবিশিষ্ট ভবন ও ছাত্রাবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পাকিস্তান আমলে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে এ মাদরাসার ভূমিকা ছিল উল্লেখ করার মতো। এ মাদরাসার বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম হলেন নওয়াব আব্দুল লতীফ ও সৈয়দ আমীর আলী। ১৯৬৩ সালে Islamic Arabic University commettee এবং ১৯৭৩ সালে মাদরাসা শিক্ষা সংস্কার ও উন্নয়নের সুপারিশ গৃহীত হয়। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর আমলে তার সুযোগ্য নির্দেশনায় মাদরাসাসমূহে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও বহুমুখী পাঠ্যসূচি প্রবর্তিত হয়। তার নির্দেশনায় কুরআন-হাদীছের উন্নত গবেষণা লিখন, পঠন ও অধ্যয়নের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। মাদরাসা ও স্কুল-কলেজের শিক্ষার ব্যবধান দূর করতে ১৯৮৫ সাল থেকে দাখিলকে এসএসসি এবং ১৯৮৭ থেকে আলিমকে এইচএসসির সমমানের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ জনতার দাবির মুখে মাদরাসা শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নে ২০০৬ সালে তৎকালীন সরকার ফাজিলকে ডিগ্রি এবং কামিলকে মাস্টার্স মান প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইসলামী

বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-এর অধীনে ফাজিলকে ডিগ্রি এবং কামিলকে মাস্টার্সের মান ঘোষণা করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৭ সালের ৪ এপ্রিল মঙ্গলবার রাতে গণভবনে আয়োজিত ক্বওমী মাদরাসার আলেম-ওলামার সঙ্গে এক বৈঠকে ক্বওমী মাদরাসার দাওরায়ে হাদীছকে মাস্টার্সের সমমান ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 'আমি ঘোষণা দিচ্ছি- 'কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদিসের সনদকে মাস্টার্স ইন ইসলামিক স্টাডিজ এবং আরবি-এর মান দেওয়া হলো'।[২]

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা এটাই বোঝা যায় যে, বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস অতি প্রাচীন। এ শিক্ষার ইতিহাস একটি সোনালী আবরণে রচিত। এটি ধর্মপ্রাণ বাঙালি জাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও আত্মিক উন্নয়নের শিক্ষা। এ শিক্ষার রয়েছে গৌরবগাঁথা তেজোদীপ্ত একটি অধ্যায়। মুসলিমদের জাতীয় চেতনা এবং স্বাধীন পরিচিতির অপরিহার্যতা বিবেচনায় ইসলামী শিক্ষা তাই হাজার বছরব্যাপী তার গৌরব ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল সমগ্র বাংলায়। স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছিল এ শিক্ষা। প্রচণ্ড ইসলামবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশরা এ শিক্ষা ধ্বংস করতে পারেনি। তখন স্কুল-কলেজে এ শিক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক। পাকিস্তান আমলেও ইসলামী শিক্ষা ছিল ধারাবাহিকভাবে বাধ্যতামূলক বিষয়ের একটি। বাংলাদেশ আমলেও এ শিক্ষা স্বগতিতে এগিয়ে চলে। ইসলামী শিক্ষার সম্প্রসারণে, কুরআন-হাদীছের উন্নত গবেষণা এবং বাংলার মুসলিম মানসে ধর্মীয় চেতনা প্রোথিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ২২শে মার্চ প্রতিষ্ঠা করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ও প্রসারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন করেন। (পূর্বে স্বায়ত্বশাসিত মাদরাসা বোর্ড ছিল না)। তিনি আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আরব বিশ্বের পক্ষ অবলম্বন ও সাহায্য প্রেরণ করেন এবং ওআইসি সম্মেলনে যোগদান করে মুসলিম বিশ্বের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। মূলত বঙ্গবন্ধু সদ্য স্বাধীন একটি ভঙ্গুর বাংলার অবকাঠামোর উপরে দাঁড়িয়ে মাত্র সাড়ে তিন বছরে মুসলিম উম্মাহর জন্য যে ভূমিকা রেখেছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশংসাযোগ্য।

উপরিউক্ত আলোচনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা মাত্র। গত দুই দশকে তাই তিনি ইসলামী শিক্ষা এবং মাদরাসার জন্য যে উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন, তা সত্যিই ইসলামপ্রিয় বাঙালির কাছে প্রশংসিত এবং নন্দিত হয়েছে। তিনি ২০১৩ সালে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য স্বতন্ত্র একটি আরবী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে সারাদেশের কলেজগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে; অনুরূপভাবে সারা বাংলাদেশের ফাজিল এবং কামিল মাদরাসাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য এটি একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। তিনি দাওরায়ে হাদীছকে মাস্টার্সের মান দিয়ে বাংলাদেশে একটি অসম্ভভ সাহসী ঘটনার জন্ম দিয়েছেন। তার এ কাজগুলো ধর্মপ্রাণ বাঙালি তৌহিদী জনতার কাছে অত্যন্ত প্রশংসনীয় হয়েছে। কিন্তু যত সমস্যা হয়েছে স্কুল-কলেজের ১০০ নম্বরের ইসলামী শিক্ষা নিয়ে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এনসিটিবি সূত্রে জানা গেছে যে, ২০২২ সালের শিক্ষা কারিকুলামে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণিতে দশটি বিষয় পড়ানো হবে। সেগুলো হলো: ১. ভাষা ও যোগাযোগ, ২. গণিত ও যুক্তি, ৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ৫. সমাজ ও বিশ্ব নাগরিকত্ব, ৬. জীবন ও জীবিকা, ৭. পরিবেশ ও জলবায়ু, ৮. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা, ৯. শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা এবং ১০. শিল্প ও সংস্কৃতি। আর দশম শ্রেণিতে বোর্ড পরীক্ষা হবে মাত্র পাঁচটি বিষয়ে। সেগুলো হলো: ১. বাংলা, ২. ইংরেজি, ৩. গণিত, ৪. বিজ্ঞান ও ৫. সামাজিক বিজ্ঞান। এতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা থাকবে না। তবে বোর্ড পরীক্ষায় ইসলাম শিক্ষা না থাকলেও পাঠ্যসূচিতে ইসলামী শিক্ষা থাকবে বলে বিবিসি সূত্রে এনসিটিবির চেয়ারম্যান নারায়ণ চন্দ্র সাহা নিশ্চিত করেছেন। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, 'পরীক্ষা না হলেই যে শিখবে না, এমনটা ঠিক না। ধর্ম ও নৈতিকতা শিক্ষাতো অনুশীলন ও অনুধাবনের বিষয়। মুখস্থ করে পরীক্ষায় কেউ লিখল কিন্তু হৃদয়ে ধারণ করল না। তাহলে তো হবে না। এখন শিক্ষার্থীদের এই চর্চার বিষয়টি যেন সঠিকভাবে মূল্যায়িত হয়, আমরা সেটাতেই গুরুত্ব দিচ্ছি'।

মূলত ইসলামী শিক্ষার প্রতি একটি মহলের কুদৃষ্টি সৃষ্টি হয় ২০০১ সাল থেকে। এ সময়ের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১০০ নম্বরের ইসলামী শিক্ষাকে ৫০ নম্বরে সংকুচিত করার হীন প্রয়াস শুরু করেন। তিন মাসের জন্য ক্ষমতায় থাকা সরকারের

২. bangladesh.gov.bd.

এ বিষয়টি চিন্তা করার কথাই ছিল না। অথচ তাদের ভিতর ঘাপটি মেরে থাকা চরম ইসলাম বিদ্বেষী কিছু ব্যক্তির ১০০ নম্বরের ইসলামী শিক্ষার প্রতি গাত্রদাহ শুরু হয়। পরবর্তীতে ধর্মীয় বাঙালি জাতির প্রতিবাদের মুখে তারা সেটা বাস্তবায়ন করতে পারেনি। এরপর ২০১৩ সালে শুরু হয় স্কুলের ইসলামী শিক্ষা নিয়ে নতুন কারসাজি। এ সময় 'ইসলাম শিক্ষা' বইয়ের নাম পরিবর্তন করা হয়। নতুন নাম দেওয়া হয় 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা'। অথচ হিন্দুধর্ম শিক্ষা ও খ্রিষ্টান ধর্ম শিক্ষা বইতে এ রকম নাম দেওয়া হলো না। এখানে প্রচ্ছন্নভাবে 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' দুটো নামের মাঝখানে 'ও' অব্যয় দ্বারা দুটো ভিন্ন জিনিস বুঝানো হয়েছে। আর উভয়ের মাঝে বিরোধ আছে মর্মে সূক্ষ্ম একটি কারসাজিরও বীজ বপন করা হয়েছে। কারসাজির এ সূত্র ধরে দুষ্টচক্রটির পরবর্তী পদক্ষেপ হবে এ শিক্ষাটিকে পাঠ্যসূচি থেকে স্থায়ীভাবে বাদ দেওয়া। একই সূত্রের ফলস্বরূপ কলেজে এ শিক্ষাবর্ষ থেকে ইসলামী শিক্ষা বিষয়টি একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে রূপ পেয়েছে। এতে কলেজের ইসলামী শিক্ষার শিক্ষকগণ ঐচ্ছিক বিষয়ের একজন গুরুত্বহীন শিক্ষকে পরিণত হয়েছেন। অন্যদিকে এ বিষয়ের ছাত্রসংখ্যাও আস্তে আস্তে লোপ পেতে পেতে তলানীতে গিয়ে থেমেছে। অথচ ২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষেও কলেজগুলোতে মানবিক, বিজ্ঞান এবং ব্যবসা- সকল শাখার শিক্ষার্থীগণ ইসলামী শিক্ষাকে আবশ্যিক সাবজেক্ট হিসাবে গ্রহণ করতো। এমতাবস্থায় মাধ্যমিকের বোর্ড পরীক্ষায় যদি ইসলামী শিক্ষা না থাকে, তাহলে এটা পাঠ্যক্রম থেকে স্থায়ীভাবে বাদ হয়ে যাওয়ার সকল বাঁধা দূর হয়ে গেল বলে পর্যবেক্ষকমহল মনে করেন।

অথচ পৃথিবীতে এখনো ইসলাম ধর্ম ও ইসলাম শিক্ষার প্রভাব বিদ্যমান। আধুনিক ধর্মহীন মতবাদগুলো পৃথিবীতে যে প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব পৃথিবীতে তার চেয়ে মোটেই কম নয়; বরং অনেকগুণ বেশি। সুদূর আমেরিকা থেকে বাংলাদেশ আর উত্তরের নরওয়ে থেকে দক্ষিণের চিলি- এ বিশাল পৃথিবীর দিকে একটু চোখ মেলে তাকালে দেখা যাবে যে, যুগ যুগ ধরে মানুষ একটু শান্তি, একটু স্বস্তি আর নির্মল জীবন যাপনের জন্য ইসলাম ধর্ম, ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী সংস্কৃতির সম্মোহনী শক্তির অনুসন্ধান করেই চলছে। আর বর্তমান বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগেও এই শিক্ষার অনুসন্ধান ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলছে। জনগণ এখনো মনে করে যে, আধুনিক মতাদর্শী নেতাদের তুলনায় প্রকৃত ধর্মীয় নেতারা অধিক নৈতিকতাবোধসম্পন্ন মানুষ। তারা আরো মনে করে যে, দেশ থেকে রাজাকার, জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ তাড়ানোর নামে ইসলামী শিক্ষা উচ্ছেদের অপতৎপরতা দেশের জন্য কখনো শুভ হবে না। তারা মনে করে, স্কুল-কলেজে ইসলামী শিক্ষা শেখানোর মাধ্যমে ধর্মান্ধতা জন্ম নেয় না। বর্তমান তরুণ প্রজন্ম বেকারত্ব, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, আয়-বৈষম্য ও পর্নোগ্রাফির বিষাক্ত ছোবলে দিশেহারা। এমতাবস্থায় তাদেরকে ন্যূনতম একটু ধর্মের শিক্ষা যদি না দেওয়া হয়, তাহলে তারাই বরং ধর্মান্ধ হবে। কতৃপক্ষের বুঝা উচিত যে, কোমলমতি শিশুদের কাছ থেকে কোনোক্রমেই ধর্ম সরানো উচিত হবে না। তাদেরকে ধর্ম থেকে দূরে সরাতে চাইলে, জাতিকে ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ রাখতে চাইলে তারাই হয়তো একসময় ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়বে। ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের মাঝে নীতিবোধ, রুচিবোধ ও নৈতিকতাবোধ সৃষ্টি হয়েছে। তারা কখনোই জঙ্গিবাদের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করেননি। তারা ধর্মান্ধ ছিলেন না। তারা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তাদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে দলে দলে লোক সেই শিক্ষা গ্রহণ করেছে। সুতরাং আমরা চাই সেই শিক্ষা স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়ুক। ধর্মপ্রাণ বাঙালির প্রাণের দাবি হলো, স্কুল এবং কলেজে আগের মতো ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকুক। বাংলাদেশের শুধু পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগ এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ আছে। অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও এই দুটি বিভাগ খোলা হোক। দাওরা মাদরাসায় অনার্স কোর্স চালু করে দাওরা মাস্টার্সধারী পোস্ট গ্রাজুয়েটদের মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হোক। দেশপ্রেমিক ধর্মপ্রাণ বাঙালি মনে করেন যে, বাংলাদেশ সবেমাত্র মধ্যম আয়ের দেশে পা রেখেছে। সরকারের এখন টার্গেট ধাপে ধাপে সেটাকে উন্নত রাষ্ট্রে উন্নীত করা। আর মাদরাসায় পড়ুয়া লক্ষ লক্ষ তরুণকে বেকার রেখে এই লক্ষে পৌঁছা সম্ভব হবে না। সুতরাং ইসলামী শিক্ষা বন্ধ নয়, বরং রাষ্ট্রীয়ভাবে তার আরো ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হোক। লোকবল নিয়োগপূর্বক প্রাতিষ্ঠানিক প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি করে দেশ থেকে বেকারত্ব লাঘব করা হোক। উন্নত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার পথকে বেগবান করা হোক- এটাই ধর্মপ্রাণ বাঙালি জাতির কামনা।

আহলেহাদীছদের উপর মিথ্যা অপবাদ ও তার জবাব

-মূল (উর্দূ) : আবু যায়েদ যামীর
অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান*

(জানুয়ারি'২১ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

(পর্ব-৪)

ভুল ধারণা-৪ : আহলেহাদীছগণ আল্লাহর ওলীদের অস্বীকার করে : অনেক মানুষ ধারণা করে যে, আহলেহাদীছগণ ওলীউল্লাহ (আল্লাহর প্রিয় বান্দা)-কে অস্বীকার করেন। কিছু নামসর্বস্ব বক্তা এই কথাকে বিভিন্ন নতুন নতুন মিথ্যা কথা দ্বারা সাজিয়ে আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলার অপচেষ্টায় লিপ্ত। বাস্তবতা হচ্ছে, আহলেহাদীছগণ 'আল্লাহর বন্ধুত্ব' বিষয়টিকে বিশ্বাস করেন। এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত কিছু মানুষ আল্লাহর ওলী থাকবেন, তাও বিশ্বাস করেন।

১. আহলেহাদীছদের মতে আল্লাহর ওলী কারা? : এই মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ 'মনে রেখো! যারা আল্লাহর বন্ধু, (পরকালে) তাদের না কোনো ভয়-ভীতি আছে আর না তারা বিষণ্ন হবে। তারা হচ্ছে সেই সকল মানুষ, যারা ঈমান এনেছে এবং ভয় তথা সাবধানতা অবলম্বন করতে থাকে' *(ইউনুস, ১০/৬২)*।

কুরআনে কারীমের অনেক আয়াতে এই বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, অনেক মানুষকে ঈমানের পূর্ণতা এবং তাক্বওয়ার উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তাআলা নিজের পক্ষ হতে বিশেষ ভালোবাসার আসন দান করবেন। তাদেরকে তাঁর বিশেষ এবং নিকটবর্তী বান্দা হিসাবে স্বীকৃতি দান করবেন। এই বক্তব্যকে অস্বীকার করা মূলত সরাসরি কুরআনে কারীম এবং ছহীহ হাদীছকে অস্বীকার করার নামান্তর। আহলেহাদীছগণ এই সকল দলীলের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে আল্লাহর ওলীদের মর্যাদাকে স্বীকৃতি দান করেন।

কিন্তু উল্লিখিত কুরআনের আয়াতে যেখানে আল্লাহর ওলীদের মর্যাদা এবং তাদের জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই তাদের গুণাগুণের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে আল্লাহর ওলীদের এই মর্যাদা লাভ হয়েছে। সেই গুণাগুণগুলো কী? আর তা হচ্ছে দুইটি জিনিস- ১. পূর্ণ ঈমান এবং ২. পূর্ণ তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি। এই ক্ষেত্রে আহলেহাদীছদের আক্বীদা হচ্ছে, জীবনে পরিপূর্ণ ও মযবূত ঈমান এবং পাপ হতে সাবধানতা ব্যতীত মানুষ আল্লাহর প্রকৃত ওলী (বন্ধু) হতে পারে না। ঐ ব্যক্তিই আল্লাহ তাআলার বন্ধু হওয়ার হক্বদার যার আক্বীদা-বিশ্বাস ও জীবন তাক্বওয়া দ্বারা সুসজ্জিত।

কিন্তু বড় আফসোসের বিষয় হচ্ছে, অনেক মানুষ আল্লাহ তাআলার বলা এই বাণীর প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে নিজের খেয়াল-খুশিমতো যাকে ইচ্ছা তাকে আল্লাহর ওলী বানিয়ে বসে। তাদের জীবন ইমামুল আম্বিয়া মুহাম্মাদ ﷺ-এর শেখানো পদ্ধতির যতই বিপরীত হোক না কেন, তাদের সাথে ঈমান ও আমলের দূরতম সম্পর্ক না থাকলেও; তারা তাদের দ্বারা আশ্চর্য ও অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হওয়াকে আল্লাহর ওলী হওয়ার মূল ভিত্তি বানিয়ে নেয়। এমনকি এর উপর ভিত্তি করে তারা এমন সব ব্যক্তিকে আল্লাহর ওলী বানিয়ে নেয়, যারা ছালাত-ছিয়াম বাদ দিয়ে সর্বদা নেশাগ্রস্ত হয়ে উল্টাপাল্টা কথা বলতে থাকে। মূলত যখন জ্ঞানচক্ষুর উপর অতিরিক্ত মিথ্যা ভালোবাসার চশমা লাগানো হয়, তখন এমনিতেই অনেক অলৌকিক ভ্রান্ত বিশ্বাস মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেই।

২. আহলেহাদীছগণ অলৌকিকতাকে আল্লাহর ওলী হওয়ার দলীল হিসাবে বিশ্বাস করেন না : কিছু নিয়ম বহির্ভূত আশ্চর্য ঘটনা বা অলৌকিক জিনিস কখনো কারও আল্লাহর ওলী হওয়ার দলীল হতে পারে না। বরং আল্লাহর ওলী হওয়ার মূল বিষয় হলো কুরআন এবং সুন্নাহর পরিপূর্ণ অনুসরণ। আসুন! এই বিষয়ে ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত মূলনীতি কী, তা জানার চেষ্টা করি।

ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ وَيَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ فَلَا تَغْتَرُّوا بِهِ حَتَّى تَعْرِضُوا أَمْرَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ 'যখন তোমরা কাউকে দেখ যে, সে পানির উপর চলছে বা বাতাসের উপর উড়ছে, তখন তার এই ঘটনার কারণে সামান্য পরিমাণও ধোঁকা খাবে না, যতক্ষণ না তার এই ঘটনাকে

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা বিচার করো'।[১] অর্থাৎ কেউ যতই কেরামতি দেখাক না কেন, তা দ্বারা ধোঁকা খাওয়া যাবে না।

উক্ত বক্তব্য দ্বারা জানা গেল যে, শুধু কেরামতির উপর ভিত্তি করে কাউকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা বা আল্লাহর ওলীর মর্যাদা দেওয়া আহলে ইলম তথা জ্ঞানীদের পদ্ধতি নয়। বরং তাদের নিকট প্রকৃত আল্লাহর ওলী সেই, যার আক্বীদা-আমল এবং ভিতর-বাহির কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ দ্বারা পরিচালিত। এই কথাই কিবারে তাবে' তথা বড় তাবেঈনের একজন ২য় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলেম খলীল ইবনু আহমাদ আল-ফারাহিদী বলেছেন, إِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيْثِ أَوْلِيَاءَ اللهِ ، فَلَيْسَ لِلّٰهِ فِيْ الْأَرْضِ وَلِيٌّ 'কুরআন ও হাদীছের অনুসারীগণ যদি আল্লাহর ওলী না হন, তাহলে জমিনের উপর আর কেউ আল্লাহর ওলী নেই'।[২]

৩. আহলেহাদীছদের মতে লাভ-ক্ষতির মালিক একমাত্র আল্লাহ : এখানে একটি কথা লক্ষণীয় যে, আল্লাহর ওলীদের মান্য করা আর তাদের কবরে গিয়ে কোনো কিছু চাওয়া, দুটির মাঝে আসমান-জমিন সমপরিমাণ তফাত রয়েছে। প্রথম বিষয়টি তথা ওলীদের মান্য করা সরাসরি ঈমানের দাবি আর দ্বিতীয়টি তথা কবরে গিয়ে চাওয়া সরাসরি তাওহীদ পরিপন্থি।

আহলেহাদীছদের আক্বীদা-বিশ্বাস হচ্ছে, বিশ্বে একমাত্র আল্লাহর একচ্ছত্র মালিকানা চলে। মানুষের উপর শান্তি-স্বস্তি, দুঃখ-কষ্ট যা কিছু আসে, সব আল্লাহর হুকুমেই এসে থাকে। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত না কেউ কাউকে কিছু দিতে সক্ষম, না কারও কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিতে সক্ষম। যেহেতু পুরো বিশ্বে একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়ে থাকে, তাই একজন মুসলিমের জন্য উচিত, সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর নিকট সাহায্য-সহযোগিতা চাওয়া। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 'যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো কষ্টে নিপতিত করেন, তবে তিনি ছাড়া কেউ তো মোচনকারী নেই। আর যদি তিনি তোমার প্রতি কোনো কল্যাণ চান, তবে তাঁর অনুগ্রহের কোনো অপসরণকারী নেই; তিনি স্বীয় অনুগ্রহ বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান, দান করেন। আর তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু' *(ইউনুস, ১০/১০৭)*।

৪. আহলেহাদীছদের মতে কবরপূজা এবং কবরকে সেজদার স্থান বানানো হারাম : আহলেহাদীছদের মতে আল্লাহর ওলী এমনকি কোনো মুসলিমের কবরকে অসম্মান করা গুনাহের কাজ। কিন্তু আল্লাহর ওলীদের কবরের নিকট নিজের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রার্থনা করা, তাঁদের কবরের চতুর্পাশে ত্বাওয়াফ করা, তাদের কবরে সেজদা করা, তারা আমাদের সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে এমন আক্বীদা পোষণ করা, কবরবাসীর সন্তান ও রোগমুক্তি দান, এমনকি তাদের কবরের মাটি ও মাটির উপরে রাখা পাত্রে সফলতা এবং মুক্তি প্রদানের ক্ষমতা এ সকল আক্বীদা ও আমল মুহাম্মাদ ﷺ-এর শিক্ষা এবং তাঁর ছাহাবীগণের আমলের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। এসব বিশ্বাস সেই তাওহীদ পরিপন্থি, যেই তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পাঠানো হয়েছিল।

আহলেহাদীছগণ আল্লাহর ওলীদের সম্মান করেন, তবে তাদেরকে আল্লাহর তওহীদ- রুবুবিয়্যাত ও উলূহিয়্যাতের মধ্যে শরীক করেন না। অর্থাৎ আহলেহাদীছগণ তাদের কবরের যথাযথ সম্মান প্রদান করেন, কিন্তু তাদের কবরকে রব এবং মা'বূদ (প্রতিপালক, উপাস্য) বা রবের সহায়ক হিসাবে স্বীকৃতি দেন না।

কবরকে উপাসনালয় হিসাবে গ্রহণ করা ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের রীতি। ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের রীতি-নীতির অনুসরণ ইসলামে সাধারণভাবেই নিষিদ্ধ। কিন্তু ইসলাম ধর্মে কবরপূজা, কবরকে সেজদার স্থান বানানোর বিষয়টি পরিষ্কারভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন, أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ 'সাবধান থেকো! তোমাদের পূর্বের যুগের লোকেরা তাদের নবী ও নেককার লোকদের কবরসমূহকে মসজিদ (সেজদার স্থান) হিসাবে গ্রহণ করত। সাবধান! তোমরা কবরসমূহকে সেজদার স্থান বানাবে না। আমি এরূপ করতে তোমাদেরকে নিষেধ করে যাচ্ছি'।[৩]

ইসলাম ধর্মে মসজিদ ঐ স্থানকে বলা হয়, যেখানে আল্লাহকে সেজদা করা হয়। সুতরাং যখন কবরকে মসজিদ বানানো বৈধ নয়, তাহলে ঐ কবরগুলোকে কী করে সেজদা করা যায়? সেজদা দেওয়া একটি ইবাদত আর আল্লাহ তাআলা নিষেধ করে দিয়েছেন যে, যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সেজদা

১. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১৩/২১৭।
২. শারফু আসহাবিল হাদীছ, ১/৯৬।
৩. ছহীহ মুসলিম, হা/১২১৬।

না করি। মহান আল্লাহ বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ 'তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে- দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও না; আল্লাহকে সেজদা করো, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা (নিষ্ঠার সাথে) শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করো' *(ফুসসিলাত, ৪১/৩৭)*।

তওহীদের স্বীকৃতি দেওয়ার পর শিরকের পথ অবলম্বন করা মুমিনের নিদর্শন নয়। এজন্যই মূলত আহলেহাদীছগণ আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কোনো ব্যক্তিকে শরীক করেন না, সে ব্যক্তি যতই বড় হোক না কেন। আহলেহাদীছগণ নিজ প্রয়োজন পূরণের জন্য দাফনকৃত সৎ ব্যক্তিদেরকে আহ্বান করেন না; আহলেহাদীছদের নিকট এমন কাজ করা শিরক। কেননা দু'আ একটি ইবাদত আর আল্লাহ ব্যতীত কারও নিকট দু'আ করা তাকে ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক করার নামান্তর।

৫. সরাসরি আল্লাহর ওলীগণ ঐ সকল ব্যক্তির দুশমন, যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট প্রার্থনা করে : মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ 'সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কাউকে ডাকে, যারা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিতে পারবে না? আর তারা তাদের ডাক সম্বন্ধে অবহিত নয়। যখন মানুষকে হাশরে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হবে এবং তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে' *(আল-আহকাফ, ৪৬/৫-৬)*।

উক্ত আয়াতে প্রত্যেক ঐ সকল ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট প্রার্থনা করে। আর আয়াতের শেষাংশে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ ব্যতীত কারও নিকট দু'আ করা মূলত তার ইবাদত করার নামান্তর। এজন্যই আহলেহাদীছদের মতে আল্লাহ ব্যতীত কবরের নিকট বা কবরবাসীর নিকট নিজ প্রয়োজন তুলে ধরে প্রার্থনা করা শিরক। এ ধরনের আমল কুরআন-হাদীছের কোথাও নেই এবং ছাহাবীগণ হতেও প্রমাণিত নয়। বাস্তবেই যদি এমন কোনো আমল ইসলামে থাকত, তাহলে ছাহাবীগণ নবী কারীম ﷺ-এর কবরের পাশে গিয়ে দ্বীন-দুনিয়ার সমস্যার সমাধান ও সকল প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করতেন।

৬. আহলেহাদীছগণ আল্লাহর ওলীদের ইবাদত করাকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার অসীলা হিসাবে গ্রহণ করেন না : আহলেহাদীছদের আক্বীদা হলো, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য আল্লাহর বান্দাদের মাধ্যম বা অসীলা বানিয়ে আল্লাহর ইবাদতে তাদের শরীক বানানো হারাম। সকল ইবাদত আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। সুতরাং আল্লাহর ওলীদের অসীলা বানানো আর এর জন্য তাদের নামে মানত করে তাদের নামে প্রাণী যবেহ করা অথবা তাদের নৈকট্য লাভের জন্য প্রাণী যবেহ করা, তাদের কবর ত্বাওয়াফ করা, তাদের কবরের উপর সেজদা করা ইত্যাদি সকল কাজ হারাম। বরং এসব কাজ সরাসরি নবী ﷺ-এর যুগের শিরক, যা তৎকালীন আরবের মুশরিকরা করত। এসব কাজ সরাসরি ঐ মুশরিকদের শিরকের ন্যায়, যা বাতিল ঘোষণা করার জন্য কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ 'আর যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মিথ্যাবাদী অবিশ্বসীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না *(আয-যুমার, ৩৯/৩)*। আরবের মুশরিকরা তাদের মূর্তির ইবাদত করত আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য। তাদের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহকে পাওয়া ছিল, কিন্তু এর জন্য তারা যে পথ অবলম্বন করেছিল, তা ভুল ছিল। আল্লাহকে পেতে শয়তান তাদের জন্য এমন রাস্তা বের করে দিয়েছিল, যা তাদেরকে আল্লাহ হতে অনেক দূরে নিক্ষেপ করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রটানোর অপরাধে অপরাধী ও কাফের হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

আহলেহাদীছদের বিশ্বাস হলো, সফলতা লাভের জন্য শুধু উদ্দেশ্য ভালো হওয়াটা যথেষ্ট নয়, বরং উক্ত উদ্দেশ্যকে অর্জন করার জন্য উপকরণ হিসাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনীত বিধি-বিধান অনুযায়ী হওয়াটাও আবশ্যক।

(চলবে)

আসলেই কি সাত যমীনে সাত জন নবী?

-আহমাদুল্লাহ*

উপক্রমণিকা :

জনৈক প্রসিদ্ধ ইসলামী ব্যক্তিত্ব দাবী করেছেন যে, সাতটি যমীনে তথা সাতটি পৃথিবীতে সাত জন মুহাম্মাদ রয়েছেন। তিনি তার দাবীর পক্ষে একটি হাদীছও পেশ করেছেন। এ ক্ষেত্রে জনমনে ভ্রান্তির অবতারণা হওয়ায় নিম্নে হাদীছটি তাহক্বীক্বসহ আলোচনা করা হলো—

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ النَّخَعِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ سَبْعَ أَرَضِينَ فِي كُلِّ أَرْضٍ نَبِيٌّ كَنَبِيِّكُمْ وَآدَمَ كَآدَمَ، وَنُوحٌ كَنُوحٍ، وَإِبْرَاهِيمُ كَإِبْرَاهِيمَ، وَعِيسَى كَعِيسَى

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, ‘সাত যমীনের প্রত্যেকটি যমীনে তোমাদের নবীর মতো নবী রয়েছেন। আদম আলাইহিস সালাম-এর মতো (আরও ছয় জন) আদম আলাইহিস সালাম আছেন। নূহ আলাইহিস সালাম-এর মতো (আরও ছয় জন) নূহ আছেন। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর মতো ইবরাহীম আছেন এবং ঈসা আলাইহিস সালাম-এর মতো ঈসা রয়েছেন’।[১]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি ছহীহ নয়। ইমাম বায়হাক্বী বর্ণনা করে নিজেই একে ‘শায’ বলেছেন।[২] আর শায হাদীছ বাতিল হাদীছ বলে গণ্য হয়। হাদীছটিকে যে সকল ইমাম ত্রুটিযুক্ত বলেছেন-

(১) যাকারিয়া ইবনু মুহাম্মাদ আনছারী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, لم يثبت ‘হাদীছটি প্রমাণিত নয়’।[৩]

(২) মোল্লা আলী কারী রহিমাহুল্লাহ একে জাল হাদীছের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৪]

(৩) আহমাদ আমিরী রহিমাহুল্লাহ একে ‘হাদীছ নয়’ বলেছেন।[৫]

(৪) ইমাম হাকেম রহিমাহুল্লাহ এ হাদীছটিকে ছহীহ বলায় ইমাম সুয়ূতী রহিমাহুল্লাহ খুবই আশ্চর্য হয়েছেন। অর্থাৎ একে ছহীহ বলা তিনি গ্রহণ করেননি।[৬]

(৫) তাহের ইবনু ছালেহ আল-জাযায়িরী রহিমাহুল্লাহ একে ‘শায’-এর আলোচনায় উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন।[৭] অর্থাৎ এটি শায হাদীছ। আর শায হাদীছ দলিলের ক্ষেত্রে বাতিল হয়ে থাকে।

(৬) আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াহইয়া আল-মুআল্লিমী আল-ইয়ামানী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ليس سنده صحيح ‘এ হাদীছটির সনদ ছহীহ নয়’।[৮]

(৭) ইবনু কাছীর রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘অনেকে মনে করেন, সাত যমীন অর্থ সাতটি রাজ্য। এটা তাদের মনগড়া কথা, যা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য এবং কুরআন-হাদীছ পরিপন্থী’।[৯]

অর্থাৎ, সাতটি যমীনের নিচে সাতটি রাজ্য আছে, সেখানে মানুষেরা বসবাস করে, এমনটা বলা কুরআন-হাদীছের বিরোধী।

যে সকল রাবীর কারণে হাদীছটি যঈফ হয়েছে :

রাবী-১ : শারীক আল-কাযী রহিমাহুল্লাহ-এর মাঝে আপত্তিকর বিষয় রয়েছে। যেমন—

(১) ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ, আব্দুল হক্ব ‘আল-আহকাম’ গ্রন্থে তাকে তাদলীসের দিকে সম্বন্ধিত করেছেন। তার পূর্বে দারাকুত্বনী রহিমাহুল্লাহ তাকে মুদাল্লিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১০] ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ নিজেও তাকে মুদাল্লিস রাবীদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি তাকে ‘তাদলীস হতে মুক্ত’ বলেছেন। এর ব্যাখ্যায় শায়েখ যুবায়ের আলী যাঈ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, সম্ভবত তিনি ‘তাদলীসুস তাসবিয়া’ হতে মুক্ত ছিলেন।[১১]

---

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১. আল-মুসতাদরাক, হা/৩৮২২; বায়হাক্বী, আল-আসমা ওয়াছ ছিফাত, হা/৮৩১।
২. প্রগুক্ত, হা/৮৩২।
৩. আসনাল মাতালিব, হা/৪২৮।
৪. আল-আসরারুল মারফূআ ফিল আখবার আল-মাওযূআ, হা/৩৮।
৫. আল-জাদ্দুল হাসীস হুয়া মা লায়সা বি হাদীছ, হা/২৪।
৬. তাদরীবুর রাবী, ১/২৬৮।
৭. তাওযীহুন নাযার ইলা উছূলিল আছার, ১/৫১২।
৮. আল-আনওয়ারুল কাশিফা, ১/১১৭।
৯. ইবনু কাসীর (ইফাবা), ১১/১৭৩।
১০. তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন, রাবী নং ৫৬।
১১. আল-ফাতহুল মুবীন ফী তাহক্বীক্ব তাবাকাতিল মুদাল্লিসীন, রাবী নং ৫৬-এর আলোচনা দ্র.।

হাফেয ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة أبو عبد الله صدوق يخطىء كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع من الثامنة 'শারীক ইবনু আব্দুল্লাহ আন-নাখাঈ আল-কূফী ওয়াসিত্বেরও পরে কূফার কাযী ছিলেন। তিনি সত্যবাদী ছিলেন; অত্যন্ত ভুল করতেন। কূফার কাযীর পদে নিযুক্ত হওয়ার পরে তার স্মৃতি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। তিনি ন্যায়পরায়ণ, মর্যাদাবান, ইবাদতগুযার, বিদআতীদের বিরুদ্ধে কঠোর ছিলেন। তিনি নবম স্তরভুক্ত'।[১২]

(২) হাফেয যাইলাঈ রাহিমাহুল্লাহ,[১৩] ইবনুল ইরাকী রাহিমাহুল্লাহ,[১৪] বুরহানুদ্দী হালাবী রাহিমাহুল্লাহ,[১৫] জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহিমাহুল্লাহ[১৬] তাকে মুদাল্লিস রাবী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

(৩) ইবনে হাযম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, وَهُوَ مُدَلِّسٌ يُدَلِّسُ الْمُنْكَرَاتِ عَنْ الضُّعَفَاءِ إِلَى الثِّقَاتِ 'তিনি মুদাল্লিস রাবী। তিনি যঈফ রাবীদের হতে ছিক্বাহ রাবীদের দিকে সম্বন্ধিত করে মুনকার বর্ণনাসমূহে তাদলীস করতেন'।[১৭]

(৪) ইবনুল কাত্তান আল-ফাসী রাহিমাহুল্লাহ তাকে মুদাল্লিস বলেছেন।[১৮] তিনি বলেন, وَشريك مَعَ ذَلِك مَشْهُور بالتدليس 'এতদসত্ত্বেও শারীক তাদলীসের কারণে প্রসিদ্ধ'।[১৯]

(৫) ইবনু আব্দুল হাদী হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, وَشريك كثير الْغَلَط وَالوهم 'শারীক অত্যধিক ভুল করতেন এবং অতিমাত্রায় ভ্রমে পতিত হতেন'।[২০]

(৬) ইবনু রজব রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, شريك، وليس بالقوي 'শারীক শক্তিশালী রাবী নন'।[২১]

(৭) নাছিরুদ্দীন আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'শারীক অত্যন্ত দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন'।[২২]

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, শারীক একজন মুদাল্লিস রাবী। এ ছাড়াও তিনি অন্যান্য কারণেও সমালোচিত। সুতরাং তার একক বর্ণনা যঈফ হয়ে থাকে।

রাবী-২ : আতা ইবনুস সায়েব রাহিমাহুল্লাহ যদিও ছিক্বাহ রাবী, কিন্তু শেষ বয়সে তার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। হাফেয যাইলাঈ রাহিমাহুল্লাহ তাকে মস্তিষ্ক বিকৃত রাবীদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[২৩] নাছিরুদ্দীন আলবানী বলেন, عطاء بن السائب اختلط آخر عمره 'আতা ইবনু সায়েব শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতির শিকার হয়েছিলেন'।[২৪]

উপসংহার :

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, উক্ত হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ। কেননা এখানে একাধিক রাবীর একাধিক ত্রুটি রয়েছে। যদি ছহীহ হতো, তাহলেও এটা ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু নিজের পক্ষ হতে ব্যাখ্যা করেছেন বলে মেনে নিতে হবে। কেননা তিনি এটা কুরআন-হাদীছ তথা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখে শুনে বলেননি; বরং নিজস্ব ইজতিহাদ দ্বারা বলেছেন, যা বাতিল।[২৫] ছাহাবীদের ইজতিহাদ অবশ্যই উঁচু মর্যাদা রাখে। কিন্তু যেহেতু এটি ছহীহ নয় এবং ইজতিহাদ দ্বারা বলাও সম্ভব নয়, সেহেতু এই বাতিল হাদীছের ভিত্তিতে সাতটি পৃথিবীতে সাত জন করে নবী-রাসূল রয়েছেন তথা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাত জন রয়েছেন বলে দাবী করা হাস্যকর ও অবাস্তব। মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সাত জন মানলে আবূ জেহেল, আবূ লাহাবকেও সাত জন মানতে হবে; কা'বা ঘরকেও সাতটি মানতে হবে, যা কোনো বিবেকবান মুসলিম কখনই গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন না। উল্লেখ্য, এই হাদীছের কোথাও মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম-নিশানাও নেই।

১২. আত-তাক্বরীব, রাবী নং ২৭৮৭।
১৩. জামেউত তাহছীল, রাবী নং ২৩।
১৪. আল-মুদাল্লিসীন, রাবী নং ২৮।
১৫. আত-তাবঈন লি আসমায়িল মুদাল্লিসীন, রাবী নং ৩৩।
১৬. আসমাউল মুদাল্লিসীন, রাবী নং ২৪।
১৭. আল-মুহাল্লা, ৭/১১৮, ১০/১৬১।
১৮. বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল ঈহাম, হা/১৩১৩।
১৯. বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল ঈহাম, হা/১৩১৪।
২০. আল-মুহাররার ফিল হাদীছ, হা/২৪৭।
২১. ফাতহুল বারী, ৭/২১৫।
২২. আছলু ছিফাত, ২/৪৪৫।
২৩. আল-মুখতালিতীন, রাবী নং ৩৩; আল-মুনতাখাব মিন ই'লাল আবূ বকর খাল্লাল, হা/৫৮।
২৪. আছলু ছিফাত, ১/২৭৪।
২৫. আসনাল মাতালিব, হা/৪২৮।

শবে মি'রাজ পালন করা স্পষ্ট বিদআত

-ওবায়দুল বারী*

মুহাম্মাদ ﷺ-এর মি'রাজ ইসলামের ইতিহাসে এক অলৌকিক ঘটনা। মি'রাজ যে ঘটেছিল তা সত্য এবং তা আমরা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হতে সুস্পষ্টভাবে জানতে পারি। ইসলাম ধর্মে মি'রাজ দিবস কিংবা শবে মি'রাজ উদযাপন করা রজব মাসের অন্যতম একটি বিদআত। কিছু অজ্ঞ শ্রেণির মানুষ এই বিদআতকে ইসলামের উপর চাপিয়ে দিয়ে প্রতি বছর তা পালন করছে। এরা রজব মাসের ২৭ তারিখকে শবে মি'রাজ পালনের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছে। এ উপলক্ষ্যে এরা একটি নয়; একাধিক বিদআত তৈরি করেছে। যেমন- মসজিদে মসজিদে একত্রিত হওয়া, মসজিদে কিংবা মসজিদের মিনারে মিনারে মোমবাতি-আগরবাতি জ্বালানো এবং কুরআন তিলাওয়াত বা যিকিরের জন্য একত্রিত হওয়া ইত্যাদি। মি'রাজ দিবস উপলক্ষ্যে ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন পীর-বুযুর্গের খানকা ও মাজারে এবং ভণ্ড বা ভ্রান্ত পীরদের দরবারে আয়োজন করা হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের। এগুলো সবই গোমরাহী এবং বাতিল কর্মকাণ্ড। এ প্রসঙ্গে কুরআন-সুন্নাহতে কোন ধরণের কোন প্রামাণ বর্ণিত হয়নি। তবে এভাবে দিবস পালন না করে যে কোনো সময় মি'রাজের ঘটনা বা শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা মোটেও দোষণীয় নয়।

প্রথমেই আমাদের মোটামুটি একটা ধারণা থাকা দরকার, কোন্ রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইসরা ও মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল?

যে রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইসরা ও মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল, সেটি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বহুকাল থেকেই ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো হাদীছ না থাকায় আলেমগণ বিভিন্নজন ভিন্ন ভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ইবনে হাজার আসক্বালানী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, মি'রাজের সময় নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেছেন, নবুঅতের আগে। কিন্তু এটা একটি অপ্রচলিত অভিমত। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মত হলো, তা হয়েছিল নবুঅতের পরে। তবে নবুঅতের পরে কখন হয়েছিল সেটা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

কেউ বলেছেন, হিজরতের এক বছর আগে। ইবনে সা'দ রহিমাহুল্লাহ প্রমুখ এ মতের পক্ষ অবলম্বন করেছেন। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ এই মতটির পক্ষে জোর দিয়ে বলেছেন। তবে ইবনে রজব রহিমাহুল্লাহ এর পক্ষে আরও শক্ত অবস্থান নিয়ে বলেন, এটাই সর্বসম্মত মত। এই মতের আলোকে বলতে হয় মি'রাজ হয়েছিল রবীউল আউয়াল মাসে।

কিন্তু তার এ মত অগ্রহণযোগ্য। কারণ এটা সর্বসম্মত মত নয়। বরং এক্ষেত্রে প্রচুর মতবিরোধ রয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে ২০টির অধিক মত পাওয়া যায়।

ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হিজরতের আট মাস আগে মি'রাজ হয়েছিল। এ মতানুসারে সেটা ছিল রজব মাসে।

আবুর রাবী ইবনে সালেম রহিমাহুল্লাহ বলেন, হিজরতের ছয় মাস আগে। এ মত অনুযায়ী সেটা ছিল রামাযানে।

ইবরাহীম আল-হারবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হিজরতের এগারো মাস আগে। তিনি আরও বলেন, হিজরতের এক বছর আগে রবীউছ ছানীতে মি'রাজ সংঘটিত হয়।

ইবনে ফারিস রহিমাহুল্লাহ এর মতে, হিজরতের এক বছর তিন মাস আগে।

এভাবে আরও অনেক মতামত পাওয়া যায়। কোনো মতে রবীউল আওয়াল মাসে, কোনো মতে শাওয়াল মাসে, কোনো মতে রামাযান মাসে আর কোনো মতে রজব মাসে।

আর শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনে রজব রহিমাহুল্লাহ-এর মতে, রজব মাসে বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হয়েছে মর্মে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়, কিন্তু কোনোটির পক্ষেই ছহীহ দলীল নেই। বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ রজবের প্রথম রাতে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন, ২৭ বা ২৫ তারিখে নবুঅত প্রাপ্ত হয়েছেন অথচ এসব ব্যাপারে কোনো ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না।[১]

আবু শামাহ রহিমাহুল্লাহ-এর মতে, গল্পকারেরা বলে থাকেন যে, ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা ঘটেছিল রজব মাসে। কিন্তু ইলমুল জারহ ওয়াত তা'দীল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলেমগণের মতে, এটা ডাহা মিথ্যা।[২]

১. লাতাইফুল মা'আরেফ, পৃ. ১৬৮।
২. আল-বাসী, পৃ. ১৭১।

* অধ্যাপক, নারায়ণগঞ্জ কলেজ।

শবে মি'রাজ পালন করার বিধান :

সালাফে ছালেহীন এ মর্মে একমত পোষণ করেছেন যে, ইসলামী শরীআত অনুমোদিত দিন ছাড়া অন্য কোনো দিবস উদযাপন করা বা আনন্দ-উৎসব পালন করা বিদআত। কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন, مَنْ أَحْدَثَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন নতুন জিনিস চালু করল তা পরিত্যাজ্য'।[৩] আর ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি এমন আমল করল যার ব্যাপারে আমার নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত'।[৪]

সুতরাং মি'রাজ দিবস অথবা শবে মি'রাজ পালন করা দ্বীনের মধ্যে নব্যসৃষ্ট বিষয় (বিদআত), যা ছাহাবী-তাবেঈ বা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী সালাফে ছালেহীন কর্তৃক পালিত হয়নি। অথচ সকল ভালো কাজে তারা ছিলেন আমাদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রগামী। ইবনুল ক্বাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনে তায়মিয়া রহিমাহুল্লাহ-এর মতে, পূর্ববর্তী যুগে এমন কোনো মুসলিম পাওয়া যাবে না, যে শবে মি'রাজকে অন্য কোনো রাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। বিশেষ করে শবে ক্বদরের চেয়ে উত্তম মনে করেছে এমন কেউ ছিল না। ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাদের একনিষ্ঠ অনুগামী তাবেঈগণ এ রাতকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোনো আচার-অনুষ্ঠান করতেন না, এমনকি এটিকে আলাদাভাবে স্মরণও করতেন না। যার কারণে জানাও যায় না যে, সে রাতটি কোনটি। নিঃসন্দেহে ইসরা ও মি'রাজ রাসূল ﷺ-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার প্রমাণ বহন করে। কিন্তু এজন্য এ মি'রাজের ঘটনা বা কালকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোনো ইবাদত করা বৈধ নয়। এমনকি যে হেরা পর্বতে অহির সূচনা হয়েছিল এবং নবুঅতের আগে যেখানে রাসূল ﷺ নিয়মিত ধ্যাণ করেছিলেন, নবুঅত লাভের পর মক্কায় অবস্থানকালে তিনি কিংবা তাঁর কোনো ছাহাবী সেখানে কোনো দিন যাননি। তারা অহি নাযিলের দিনকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোনো ইবাদত-বন্দেগী করেননি বা সেই স্থান বা দিন উপলক্ষ্যে বিশেষ কিছুই করেননি। যারা এ জাতীয় দিন বা সময়ে বিশেষ কিছু ইবাদত করতে চায় তারা ঐ আহলে কিতাবদের মতো, যারা ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জন্মদিবস (Christmas) বা তাদের দীক্ষাদান অনুষ্ঠান (Baptism) ইত্যাদি পালন করে।

উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু দেখলেন, কিছু লোক একটা জায়গায় ছালাত আদায়ের জন্য হুড়োহুড়ি করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? তাঁরা বললেন, এখানে আল্লাহর রাসূল ﷺ ছালাত আদায় করেছিলেন। তিনি বললেন, তোমরা কি তোমাদের নবীদের স্মৃতির স্থানগুলোকে সিজদার স্থান বানাতে চাও? তোমাদের পূর্ববর্তী যামানার লোকেরা এসবের কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। এখানে এসে যদি তোমাদের কারও ছালাতের সময় হয়, তবে সে যেন ছালাত আদায় করে অন্যথা সামনে অগ্রসর হয়।[৫]

ইবনুল হাজ্জ রহিমাহুল্লাহ বলেন, রজব মাসে যে সকল বিদআত আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে ২৭ তারিখের লায়লাতুল মি'রাজের রাত অন্যতম।[৬]

রজব মাসে নফল ছালাত আদায়, ছিয়াম পালন করা, মসজিদ, ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, দোকান-পাট ইত্যাদি সাজানো বা আলোকসজ্জা করা কিংবা ২৬ তারিখ দিবাগত রাত তথা ২৭শে রজবকে শবে মি'রাজ নির্ধারণ করে রাত জেগে ইবাদত করার ব্যাপারে কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নেই। তাই আমাদের কর্তব্য হবে, এগুলো থেকে দূরে থাকা। অন্যথা আমরা বিদআতি হিসেবে আল্লাহ তাআলার দরবারে গুনাহগার সাব্যস্ত হব। অবশ্য কোনো ব্যক্তি যদি প্রতি মাসে নফল ছিয়াম পালন করে, সে এ মাসেও সেই ধারাবাহিকতা অনুযায়ী ছিয়াম রাখতে পারে। শেষ রাতে উঠে যদি নফল ছালাত আদায়ের অভ্যাস থাকে, তবে এ মাসের রাতগুলোতেও ছালাত আদায় করতে পারে।

শরীআতে এদিন উপলক্ষ্যে বিশেষ কোনো আমল করার দলীল নেই। আমাদের সমাজে শবে মি'রাজ উপলক্ষ্যে যে আমলগুলো দেখা যায়, সেগুলো হলো- (ক) ১২ রাক'আত ছালাত আদায় করা, (খ) ছিয়াম রাখা, (গ) উমরার নিয়্যত করা ও আদায় করা এবং (ঘ) কবর যিয়ারত করা।

ঐ দিন এই সকল ইবাদত পালন করা বিদআত। জ্ঞানহীন ও দ্বীনের ব্যাপারে গাফেল ধর্মান্ধ মুক্বাল্লিদ কিছু নামধারী আলিমের ফৎওয়ার ভিত্তিতে আমাদের সমাজের মুসলিমদের মি'রাজ উপলক্ষ্যে সারা রাত নফল ছালাত এবং দিনে ছিয়াম রাখতে দেখা যায়। অথচ তাদের কাছে এর কোনো দলীল নেই। তাদের দলীল হলো- বাজারে প্রচলিত কতিপয় ভ্রান্ত বিদআত

৩. ছহীহ বুখারী, 'সন্ধি-চুক্তি' অধ্যায় (ই.ফা.), হা/২৫১৭।
৪. ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮।
৫. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, হা/৩৭৬, ৩৭৭।
৬. আল-মাদখাল, ১/২৯৪।

নির্ভর বই-পুস্তক। অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন যে, নফল ছালাত আদায় করা, নফল ছিয়াম রাখা এগুলো কি বিদআত? নফল ইবাদতের আবার দলীল লাগবে কেন? ঐ দিন এই সকল নফল ইবাদত করা যাবে না তার দলীল কোথায়?

এর জবাবে আমরা এ কথাই বলব, কথাগুলো সত্য, কিন্তু উদ্দেশ্য খারাপ। এগুলো সব মস্তিষ্কপ্রসূত শয়তানী যুক্তি! সমাজে বিদআত এভাবেই প্রতিষ্ঠা পায়। কুরআন-হাদীছের দলীল ছাড়া কোনো কাজ ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে না। তাছাড়া কোনো ইবাদতকে কোনো দিবসের সাথে সম্পৃক্ত করতে হলে, সেখানেও দলীল লাগবে। দলীলবিহীন আমল কখনোই আল্লাহ তাআলার নিকট গ্রহনযোগ্য হবে না। বরং বিদআত করার কারণে এর পালনকারী কঠিন গুনাহগার হবেন। আর দলীল হলো কুরআন-হাদীছ অথবা ছাহাবায়ে কেরামের আমল।

লক্ষ্য করুন, রাসূল ﷺ কিন্তু মি'রাজের পরের দিনই মৃত্যু বরণ করেননি। পরের বছরও তাঁর মৃত্যু হয়নি; বরং তিনি বেঁচে ছিলেন আরও ১০/১১ বছর। এই বছরগুলোতে তিনি কোনো দিন মি'রাজের রাত উপলক্ষ্যে ১২ রাক'আত ছালাত আদায় করেছেন অথবা নফল ছিয়াম রেখেছেন এ মর্মে একটি ছহীহ হাদীছও পাওয়া যায় না। রাসূল ﷺ যেই দিনকে কোনো ইবাদতের উপলক্ষ্য বানালেন না, সেই দিনকে কীভাবে আমরা ইবাদতের উপলক্ষ্য বানাতে পারি? আমরা কি রাসূল ﷺ -এর চেয়ে শরীআত সম্পর্কে বেশি অবগত হয়ে গেছি? অথবা আমরা কি এমনটা ভাববো যে, রাসূল ﷺ এই ইবাদত পালনের কথা তাঁর উম্মতদের বলতে ভুলে গেছেন? *(না'উযুবিল্লাহ)*

এমনকি রাসূল ﷺ -এর কোনো ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ এমন আমল করেছেন তার প্রমাণ নেই। তাঁরা যা করেননি, আমাদের তা করার উদ্দেশ্য কী? 'মায়ের চাইতে মাসীর দরদ বেশি'-এর মতো হয়ে গেল না তো ব্যাপারটা?

সালাফে ছালেহীন এ মর্মে একমত যে, ইসলামী শরীআতে অনুমোদিত দিন ছাড়া অন্য কোনো দিবস উদযাপন করা বা আনন্দ-উৎসব পালন করা বিদআত। কারণ রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে স্পষ্ট বলেছেন, مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ 'যদি কেউ আমাদের এই দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে যা তাতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৭]

সুতরাং মি'রাজ দিবস অথবা শবে মি'রাজ পালন করা দ্বীনের মধ্যে সৃষ্ট সুস্পষ্ট বিদআত। রাসূল ﷺ -এর মৃত্যুর পর তাঁর ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ থেকেও এ দিনকে উপলক্ষ্য করে কোনো ইবাদত করার প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ সকল ভালো কাজে তারা ছিলেন আমাদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রগামী।

সুতরাং এ দিবসকে কেন্দ্র করে যে কোনো ইবাদত করা হোক না কেন, তা বিদআত হিসাবেই পরিগণিত হবে। তাই আসুন! এই বিদআত থেকে নিজে বাঁচি, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে বাঁচাই। আল্লাহ আমাদের বিদআত ছেড়ে সারা জীবন ছহীহ আমল করার ক্ষমতা দিন। তিনি আমাদেরকে সকল অবস্থায় তাওহীদ ও সুন্নাহর উপর আমল করার তাওফীক্ব দান করুন এবং শিরক ও বিদআত থেকে হিফাযত করুন- আমীন!

৭. ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৩৮৪, ৪৩৮৫; আবূ দাঊদ, হা/৪৬০৬; আহমাদ, হা/২৬০৯২।

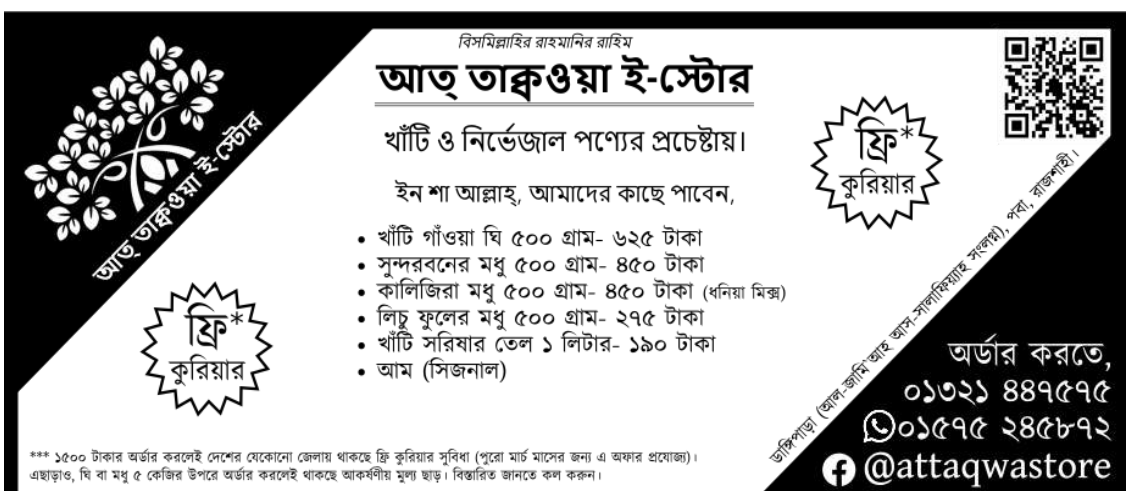

কুরআন মাজীদে বর্ণিত শ্রেষ্ঠ প্রাণী পরিচিতি

-এস.এম. আব্দুর রঊফ*

ভূমিকা : মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ‘পৃথিবীতে এমন কোনো প্রাণী নেই, এমন কোনো উড়ন্ত জীব নেই, যারা তোমাদের মতো শ্রেণির (Community) অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আমি এ গ্রন্থে কোনো কিছুর বর্ণনা করতে ছাড়িনি। অবশেষে তারা সকলেই একত্রিত হবে তাদের প্রভুর সমীপে’ *(আল-আনআম, ৬/৩৮)*।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের উক্ত আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, প্রাণিজগতের প্রত্যেক শ্রেণি গঠিত হয় তাদের নিজস্ব প্রজাতির আলোকে। এ প্রজাতিভুক্ত প্রাণীরা পৃথিবীর বুকে কেউ হামাগুঁড়ি দিয়ে চলে, কেউবা পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করে, আবার কেউ বাতাসে উড়ে বেড়ায়। পৃথিবীতে প্রাণীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অতি নিবিড়। বিজ্ঞান আবিষ্কারের পূর্বে এ সম্পর্ক তেমন ঘনিষ্ঠ ছিল না, বরং বৈরী ভাবাপন্ন ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির দরুন মানুষ সচেতন হয়ে ওঠে। আল-কুরআনে মানুষ ব্যতীত অন্য যেসব কীটপতঙ্গ ও জীবজন্তুর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। যেমন: মৌমাছির চালচলন, মাকড়সার জাল বুনন, মরুভূমির উট, ভারবাহী পশু, শূকর, মৃত পশু-পাখি এসবের উপস্থাপনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।[১]

আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনে ৩০টি শ্রেণির প্রাণীর নাম উল্লেখ করেছেন। সকল জীবজন্তু ও প্রাণীকুলকে অর্থ করতে بهيمة- أنعام -دابة (বাহীমাত, দাব্বাত, আনআম) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আবার অনেক জায়গায় বিশেষ প্রাণীর নাম উল্লেখপূর্বক নির্দেশিত হয়েছে। আল-কুরআনে উল্লিখিত প্রাণীদের বর্ণনা, অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, উপকারিতা, অপকারিতা এবং এদের প্রাপ্তিস্থান বৈজ্ঞানিক পরিচিতি ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে কুরআনে বর্ণিত সৃষ্টির সেরা প্রাণী মানুষের পরিচিতি, অবস্থা ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

মানুষ : মানুষ শব্দের আরবী প্রতিশব্দ কুরআনে إِنْسَانُ- بشر- ناس (ইনসান, বাশার, নাস) উল্লেখ আছে। إنسان শব্দটি পবিত্র কুরআনে ৩৯টি সূরায় ৫৮টি আয়াতে মোট ৫৮ বার উল্লেখ করা হয়েছে। إنسان শব্দটি ال ছাড়া ১ বার *(আল-ইসরা, ১৭/১৩)*, الإنسان তথা ال সহ ৫৬ বার। الناس তথা ال সহ ১৭২ বার। আর তন্মধ্যে ৩৩টি মাক্কী সূরা আর বাকী ৬টি যথা- সূরা আন-নিসা, আল-হজ্জ, আল-আহযাব, আর-রহমান, আল-ইনসান, আয-যিলযাল মাদানী সূরা। إنسان শব্দটি পবিত্র কুরআনের ৫৬টি সূরায় ৫৮ বার পুনঃআবৃতি করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর সকল সৃষ্টির সেরা প্রাণী হলো মানুষ। আল্লাহ তাআলার বাণী, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ‘আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম অবয়বে’ *(আত্ব-ত্বীন, ৯৫/৪)*। এই মহাগ্রন্থ অবতীর্ণের একমাত্র উদ্দেশ্য মানবজাতির হেদায়াত; সাথে জিন জাতিরও। মানবজাতির এ হেদায়াতের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখার উপর কোথাও সংক্ষিপ্ত আবার কোথাও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হেদায়াতের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে স্রষ্টার সন্ধান লাভ।[২] আর স্রষ্টার জ্ঞান যেহেতু অসীম, তাই সসীম জ্ঞান দিয়ে কোনো সৃষ্টির পক্ষেই অসীম স্রষ্টাকে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। সুতরাং সৃষ্টি তার স্রষ্টা সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করে মাত্র। বিচিত্র এ জগত, তার চেয়েও বিচিত্র এ জগতের মানুষ ও প্রাণীকুল। আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি মানুষ। মানুষ আশরাফুল মাখলূক্বাত। সৃষ্টির সেরা বিভিন্ন বর্ণ, ধর্ম এবং গোত্রের মানুষ ও প্রাণী দ্বারা এ জগৎ পরিপূর্ণ। মানুষ প্রধানত প্রাণী। প্রাণী হিসাবে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। প্রাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রাণত্ব বা প্রাণবৃত্তি। মানুষেরও একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রাণবৃত্তি।

তবে মানুষের মধ্যে অতিরিক্ত এক স্বতন্ত্র গুণ রয়েছে, যা তাকে অন্যান্য জীব ও প্রাণীকুল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রেখেছে। এই অতিরিক্ত স্বতন্ত্র গুণ হচ্ছে তার ‘বুদ্ধি’। এ বুদ্ধির কারণেই মানুষ শুধু প্রাণী নয়; সে মানুষ এবং মানুষ নামেই পরিচিতি লাভ করেছে। এখানেই অন্যান্য প্রাণী থেকে তার শ্রেষ্ঠত্ব। আর এ শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই পৃথিবীর সকল সৃষ্টি তার কর্তৃত্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণে। বস্তুত মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য। আর

* পি-এইচ.ডি গবেষক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া; এ্যারাবিক লেকচারার, শরীফবাগ কামিল মাদরাসা, ধামরাই, ঢাকা।

১. মুহাম্মাদ আবু তালেব, Al Quran is all science (চতুর্থ সংস্করণ, আরজু পাবলিকেশন্স), পৃ. ২৩৫।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

মানুষের প্রয়োজন, কল্যাণ ও উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন সকল প্রকার প্রাণী।

মানুষের সাধারণ পরিচিতি : মানুষের আরবী শব্দ 'আল-ইনসান'। বৈজ্ঞানিক নাম Homo Sapiens.

মানুষের গঠন : দেহ এবং আত্মা- এই দুইয়ের সমন্বয়ে মানুষ গঠিত।

মানুষের প্রধান অন্ত্রসমূহ : ১. ত্বকতন্ত্র ২. কংকালতন্ত্র ৩. পেশীতন্ত্র ৪. পরিপাকতন্ত্র ৫. সংবহনতন্ত্র ৬. শ্বসনতন্ত্র ৭. রেচনতন্ত্র ৮. স্নায়ুতন্ত্র ৯. অন্তঃরেখা গ্রন্থিতন্ত্র ১০. প্রজননতন্ত্র।

মানুষের আদি উৎস (The origin of man) : পৃথিবীতে মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। এগুলোর মধ্যে অগ্রহণযোগ্য ও ভুল মতবাদ হচ্ছে, চার্লস ডারউইনের 'মানব বিবর্তনবাদ' তত্ত্বটি।

এতে ডারউইন বলেছে, প্রতিটি জীব বিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বলেই বর্তমান আধুনিক মানব প্রজাতি বিবর্তনের আওতাভুক্ত এবং আদি Primate (chordata) (Legs) এর একটি শাখার উন্নত সংস্করণই বর্তমান সুন্দর মানব।

বহু কোষী কর্ডাটা (chordata) পর্বের মেরুদণ্ডী ও স্তন্যপায়ী চার পা বিশিষ্ট বানর, গরিলা, শিম্পাঞ্জি এবং মানুষ প্রাইমেট শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। আদি প্রাইমেটের বিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন শাখায় কেউ হয়েছে বানর, কেউ হয়েছে গরিলা, কেউ শিম্পাঞ্জি এবং সর্বাধিক বিবর্তনের ফলে সহায়ক প্রজাতির একটি শাখা মানুষে পরিণত হয়েছে।[৩]

ঊনবিংশ শতাব্দির বিজ্ঞানীরা ডারউইনের উক্ত মতবাদটি সঠিক নয় বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেবল কিছু সংখ্যক নাস্তিক বুদ্ধিজীবী এখনো এ তত্ত্বকে সঠিক বলে থাকে। বাস্তববাদী বিজ্ঞানীরা ডারউইনের উক্ত মতবাদটি অবাস্তব বলে যুক্তি দিয়েছেন যে, 'যদি বানর কিংবা শিম্পাঞ্জির বিবর্তনের ফলে মানুষ সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে মানুষের বিচার ক্ষমতা, প্রজ্ঞা, বিবেক, বুদ্ধিমত্তা, আত্মশক্তি, উদ্ভাবনীশক্তি, চিন্তাশক্তি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যও কি বিবর্তনের ফল? যা বানর কিংবা শিম্পাঞ্জির মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। প্রাণী জগতের মধ্যে একমাত্র মানুষই কথা বলতে পারে।

স্বরযন্ত্রের সাহায্যে শব্দ তৈরি করে কথা বলার জন্য মানুষের মস্তিষ্কে একটা অঞ্চল রয়েছে, যার নাম 'ব্রোকার জোন'। বানর, গরিলা, শিম্পাঞ্জি কিংবা অন্য যে কোনো প্রাণীর মস্তিষ্কে 'ব্রোকার জোনের' সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাই অন্যান্য প্রাণীরা কথা বলতে পারে না। এসব বৈশিষ্ট্য ছাড়াও ৬টি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মানুষের আছে, যা বানর কিংবা শিম্পাঞ্জির মধ্যে নেই।[৪] যেমন-

১. চলন : শুধু মানুষই দু'পায়ে হাঁটতে সক্ষম।

২. মুষ্ঠিবদ্ধতা : মুষ্টিবদ্ধ করার ক্ষমতা কেবল মানুষের রয়েছে। লিখা, ইচ্ছামতো নাড়াচাড়া করা, অস্ত্র চালানোর কাজ ও অন্যান্য কাজ করতে পারে মানুষ।

৩. মস্তিষ্কের বিকাশ : মানুষের মস্তিষ্ক এতো বেশি উন্নত, যার ফলে পৃথিবী ভ্রমণ, মহাকাশে অভিযান চালাতে পারে।

৪. শৈশব ও প্রাক-বয়ঃসন্ধিকাল : মানুষের শৈশব ও প্রাক-বয়ঃসন্ধিকাল দীর্ঘ হওয়ায় মা ও শিশুর সম্পর্ক ঘনিষ্ট হয়েছে এবং মায়ের কাছ থেকে শিশু শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছে।

৫. সামাজিক জীবন : উন্নত সামাজিক জীবন মানুষের অন্যতম সাফল্য এবং পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তারের অন্যতম মূল শক্তি।

৬. নৈতিক বিকাশ : নীতিগতভাবে মানুষ সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ ও আলো-আঁধার ইত্যাদি পার্থক্য করতে পারে ।

'মলিকুউল' ভিত্তিক কার্বন ব্যবহারের ফলে যেসব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে, সেসব বিক্রিয়ার ধারাবাহিকতার মধ্যে সৃষ্ট যে প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞনীরা জীবন (Life) হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এ প্রক্রিয়া দ্বারা জীবন একটি সিস্টেমে পরিণত হয়েছে এবং জীবনের এ সিস্টেম বৃদ্ধি ও প্রজনন কাজে সাহায্য করেছে। যেসব কোষ দ্বারা মানুষ সৃষ্টি হয়, সেসব কোষকে প্রধানত চার ধরনের জৈব পদার্থ (organic substance) দেখাতে পারে। এসব জৈব পদার্থ হলো- কার্বোহাইড্রেট, ফেটস, নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিন।

এ চার ধরনের উপাদানের সাথে অজৈব বস্তু (inorganic substance) জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে যে আধুনিক চিন্তা-ভাবনা তা হলো কীভাবে জৈব বস্তু অস্তিত্ব লাভ করেছে। প্রাণীদেহ তৈরি হয় একটার পর একটা কোষ সাজিয়ে। কোষের অভ্যন্তরে যে নিউক্লিয়াস রয়েছে, তার মধ্যে আছে DNA (Dioxiribo Nucleic Acid)। জীবনের শুরু অবশ্যই DNA থেকে। DNA এর গঠন পদ্ধতি এতই জটিল যে, এটিকে দেখতে কিছুটা মোচড়ানো (twisted) মইয়ের মতো মনে হয়। বিজ্ঞানীরা একে বলে Double Helix (স্ক্রুর ন্যায় পেঁচানো)। এ মইয়ের ধাপগুলো চার ধরনের মলিকুউলের বহুবিধ জোড়ার সংযোগে তৈরি হয়ে থাকে। এরা হলো অ্যাডানিন (adenin),

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

থাইমিন (thyamine), গুয়ানিন (guanine) ও সাইটোসিন (cytosine)।

মানুষ যে দেখতে ঠিক মানুষের মতো, বানর কিংবা শিম্পাঞ্জির মতো নয়, তার কারণ মানুষের ডিএনএ (DNA) ওদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীরই রয়েছে আলাদা আলাদা DNA.[৫]

কুরআনের আলোকে মানব সৃষ্টি : মানুষের সৃষ্টি প্রসঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে, এই মানুষের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। আল্লাহ তাআলা বলেন, أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى 'মানুষ কি সেই সামান্যতম শুক্র ছিল না, যা সজোরে নির্গত হয়েছিল?' *(আল-ক্বিয়ামাহ, ৭৫/৩৭)*। পক্ষান্তরে মানবদেহে এই শুক্র এলো কোথা থেকে? পৃথিবীতে আমরা যা কিছু দেখি এসবের মূল উপাদান হলো মাটি। মাটি থেকেই সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ মাটি থেকে উৎপন্ন খাদ্য আহার করে। দেহ এবং দেহের অভ্যন্তরে যা কিছু আছে, তা গঠিত হয় গ্রহণকৃত খাদ্যের সার নির্যাস থেকে। মানুষের দেহ থেকেই শুক্র নির্গত হয়। অতএব শুক্রের মূল উপাদান হলো মাটি। এজন্যই বলা হয়, মানুষ সৃষ্টি হয়েছে মাটি থেকে। অসংখ্য কোষ (Cell) দিয়ে মানবদেহ গঠিত। এই অসংখ্য কোষ সর্বপ্রথম বিস্তৃতি লাভ করেছে একটিমাত্র কোষ থেকে। একটি পুরুষ প্রজনন কোষ, যাকে বলা হয় শুক্রানু (Sperm) এবং আরেকটি স্ত্রী প্রজনন কোষ, যাকে বলা হয় ডিম্বানু ((Ovum)। এ দু'টি কোষের কোষ মিলিত হয়ে অন্য একটি কোষ উৎপন্ন হয়, যাকে বলে জাইগোট (Zygote)। বিভাজনের মাধ্যমে এই জাইগোট মহান আল্লাহর নির্দেশে ক্রমশ মাতৃগর্ভে বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। মাতৃগর্ভের জরায়ু (Uterus) থেকে স্থানান্তরিত হয়ে ভ্রূণ তৈরি হয়।

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا 'হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট অধিকার দাবি করে থাকো এবং আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন আছেন' *(আন-নিসা, ৪/১)*।

মাতৃগর্ভে আল্লাহর সুনিপুণ ব্যবস্থাপনায় ভ্রূণ বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। এভাবে প্রায় ৪০ সপ্তাহ পর অপূর্ব সুন্দর মানব শিশু পৃথিবীতে আগমন করে। মহান রব্বুল আলামীন বলেন, خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ 'তিনি মানুষকে এক ক্ষুদ্র বিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন' *(আন-নাহল, ১৬/৪)*।

নুত্বফা শব্দ দ্বারা শুক্রানু ও ডিম্বানুকে বুঝানো হয়েছে। এসব পদার্থকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যার একটি সাইটোপ্লাজম এবং অপরটি নিউক্লিয়াস। এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে অবস্থান করে DNA। মূলত এ জিনিসটিই হচ্ছে প্রাণীজগতের বংশগতির ধারক-বাহক। প্রতিটি প্রাণীর DNA ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের। ফলে এক প্রাণীর গর্ভ থেকে ভিন্ন প্রজাতির প্রাণী জন্মগ্রহণ করে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا 'তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্টি করেছেন' *(আন-নূহ, ৭১/১৪)*।

মানুষ মাতৃগর্ভে কীভাবে অবস্থান করে এবং কয়টি পর্যায় অতিক্রম করে এই পৃথিবীতে আসে? এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ 'তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে। অতঃপর তা থেকে তার যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাদের জন্য আট প্রকার চতুষ্পদ জন্তু অবতীর্ণ করেছেন। তিনিই মাতৃগর্ভে তিনটি অন্ধকারময় আবরনের মধ্যে তোমাদেরকে একের পর এক সজ্জিত করেছেন। তিনি আল্লাহ যিনি তোমাদের রব। প্রভুত্ব সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই, তিনি ব্যতীত রাজত্ব লাভের অধিকারী কারো নেই' *(আয-যুমার, ৩৯/৬)*।

আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টি করার পর তাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়ে সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তার আত্মা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যার নাম হাওয়া। তিনি সমগ্র মানবজাতির আদি মাতা। আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম-এর শুভ বিবাহ হওয়ার পর থেকে সন্তানের ধারা অব্যাহত রয়েছে। সরাসরি মানুষ সৃষ্টির আর প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًاوَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

‘হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার স্ত্রীকেও সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের দুজন থেকে বিস্তার করেছেন অগণিত নারী-পুরুষ। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট অধিকার দাবি করে থাকো এবং আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন’ *(আন-নিসা, ৪/১)*।

বর্তমান মেডিক্যাল সাইন্স এই তিনটি অন্ধকারাচ্ছন্ন আবরণকে বলেছে, (chromosome)। বিজ্ঞানীদের গবেষণা অনুসারে প্রতিটি মানুষের দেহে যে কোষ রয়েছে, তার ভিতরে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম (chromosome) রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ২২ জোড়া উভয় লিঙ্গে একই রকম এবং সেগুলোকে অটোসোম (autosome) বলে। কিন্তু ২৩তম জোড়ার ক্রোমোজোম নারী ও পুরুষ সদস্যের ভিন্নতর এবং এগুলোকে হেটারোজোম (heterosome) বা সেক্স ক্রোমোজোম (sex chromosome) বলে। মানব দেহে দু’ধরনের সেক্স ক্রোমোজম রয়েছে, যা (x) ও (y) ক্রোমোজোম নামে পরিচিত। যার দেহে ২৩তম ক্রোমোজোম জোড় দুটি (x) ক্রোমোজোমে (x x) গঠিত সে ব্যক্তি নারী। অন্যদিকে যার দেহে ২৩ ক্রোমোজোম জোড়ের একটি (x) ও অন্যটি (y) ক্রোমোজোম (x y) সে ব্যক্তি পুরুষ। স্ত্রী গ্যামিট (ডিম্বানু) যদি (y) ক্রোমোজোমবাহী পুরুষ গ্যামিট দিয়ে নিষিক্ত হয়, তাহলে সন্তান হবে পুত্র (x y)। আর যদি (x) ক্রোমোজোমবাহী গ্যামিট দিয়ে নিষিক্ত হয়, তাহলে সন্তান হবে কন্যা (x x)। অর্থাৎ পিতার গ্যামিটই সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য দায়ী; এ ক্ষেত্রে মায়ের কোনো ভূমিকা নেই।[৬] মহান আল্লাহ বলেন, وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ‘আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর শুক্রকীট থেকে। এরপর তোমাদেরকে জোড়ায় পরিণত করা হয়েছে। তার জ্ঞানের বাইরে কোনো নারী গর্ভবতী হয় না বা সন্তান প্রসব করে না’ *(ফাতির, ৩৫/১১)*। তিনি আরও বলেন, ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ‘অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আঁধারে। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিণ্ডে, অতঃপর রক্তপিণ্ডকে পরিণত করি গোশতপিণ্ডে এবং গোশতপিণ্ডকে পরিণত করি হাড়সমূহে; অতঃপর হাড়সমূহকে ঢেকে দিই গোশত দ্বারা; অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে; অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান’ *(আল-মুমিনূন, ২৩/১৩-১৪)*।

মানুষ আশরাফুল মাখলূক্বাত। মহান আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষের দুটি পরিচয় আছে। এক আল্লাহর দাস এবং অপরটি আল্লাহর প্রতিনিধি। একদিক থেকে মানুষ জন্মগতভাবেই আল্লাহর প্রতিনিধি আর অপরটি হলো দাস। তাতে সে যে ধর্মেরই হোক না কেন, প্রতিনিধি হিসাবে মহাবিশ্বে বা জান্নাতে তার গন্তব্যস্থল এলাকা নির্ধারিত হয়ে আছে। দাস হিসেবে তাকে যাবতীয় বিধান মেনে চলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।[৭] এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

‘তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে। আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম, অতঃপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করল ও ভয়ে ভীত হয়ে গেল। অবশেষে মানুষই তা বহন করে নিল। নিশ্চয়ই সে একান্ত যালেম ও অজ্ঞ। যাতে আল্লাহ মুনাফেক্ব পুরুষ, মুনাফেক্ব নারী, মুশরেক পুরুষ, মুশরেক নারীদেরকে শাস্তি দেন এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’ *(আল-আহযাব, ৩৩/৭১-৭৩)*।

উপসংহার : মানুষ জীবজগতের সর্বাপেক্ষা উন্নত জাতি। উচ্চ শ্রেণির মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে মানুষ সবচেয়ে বুদ্ধিমান বাকশক্তিসম্পন্ন জীব। নিজ বুদ্ধি বলে মানুষ পৃথিবীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছে। সৃষ্টির আদি থেকে তথা আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম -এর পর নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মানবজাতি আজ এই স্তরে উপনীত হয়েছে।

৬. গাজী আজমল ও গাজী আসমত, উচ্চ মাধ্যমিক জীব বিজ্ঞান, ২য় পত্র, প্রাণিবিজ্ঞান, পৃ. ৪৯-৫০।

৭. মানুষ ও মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য (ই.ফা.বা.), পৃ. ১৪২।

যবান হেফাযতের গুরুত্ব ও ফযীলত

-উসমান বিন আব্দুল আলিম*

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন। প্রতিটি মানবশরীরের প্রতিটি অঙ্গ আল্লাহ প্রদত্ত অগণিত নিয়ামতের অন্যতম। যেমন : চোখ, নাক, জিহ্বা, হাত, পা, মাথা, ব্রেন, কান ইত্যাদি। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন, وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا 'তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা করতে চাইলে তা গুণে শেষ করতে পারবে না' *(ইবরাহীম, ১৪/৩৪)*।

এই অসংখ্য নেয়ামতের মধ্যে জিহ্বা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, জিহ্বা বা বাকশক্তি আল্লাহ তাআলার বড় নেয়ামত ও মহাদান। বান্দার বহুবিধ কল্যাণ এতে নিহিত রয়েছে। বহুমুখী প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে তিনি বান্দাকে এ নেয়ামত দান করেছেন। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে এসব প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব নয়। যবানের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হলে অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। কোনো কিছুই যবানের বিকল্প হতে পারে না। মনের ভাব, দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, আনন্দ-উল্লাস ইত্যাদি প্রকাশে এই জিহ্বা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বলতে গেলে যবান সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মুখপাত্র। বোবার মনে কত দুঃখ-কষ্ট, কত আনন্দ-বেদনা চাপা পড়ে থাকে, কাউকে সে জানাতে পারে না। জীবনের প্রতিটি ধাপে যার বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যে বাকশক্তি হারিয়েছে সেই উপলব্ধি করতে পারে, যবান কত বড় নেয়ামত!

আবার এই যবান মানুষের জন্য জান্নাত বা জাহান্নামে যাওয়ার মাধ্যম। অর্থাৎ এই যবানের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ জান্নাতে যাওয়ার উপযুক্ত হয়। আবার এর অপব্যবহারের ফলে মানুষ জাহান্নামের উপযোগী হয়। অনুরূপভাবে যবান মানুষকে কখনো সম্মানের পাত্র বানায়, আবার কখনো লাঞ্ছনার শিকার হওয়ায়।

অপরপক্ষকে মিথ্যা, গীবত, অপবাদ, গালিগালাজ, কর্কশ ভাষা, মানুষকে আল্লাহর অসন্তোষ, ক্রোধ ও জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। কুরআন ও হাদীছে যবানের হেফাযত করার বিষয়টি খুবই গুরুত্ব সহকারে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ যবানের হেফাযত, সঠিক ব্যবহার, অপব্যবহার থেকে বিরত থাকা, ফযীলত ইত্যাদি সম্পর্কে। আমি সেখান থেকে বাছাইকৃত কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

* মুহাদ্দিছ, দারুল উলূম মোহাম্মদপুর কওমি মাদ্রাসা, চাটমোহর, পাবনা।

যবান হেফাযতের গুরুত্ব :

যবান হেফাযতের মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন প্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ ব্যাপক গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, 'যে আল্লাহ ও শেষ দিবসকে বিশ্বাস করে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে'।[১] একবার রাসূল ﷺ তাঁর প্রিয় ছাহাবী উক্ববা ইবনু আমের রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে তিনটি অছিয়ত করলেন। এর প্রথমটি ছিল, 'তুমি তোমার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো'।[২] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'সেই সত্তার কসম, যিনি ছাড়া কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই। ভূপৃষ্ঠে সবকিছুর চেয়ে জিহ্বাই সবচেয়ে বেশি বন্দিত্ব ও নিয়ন্ত্রণের মুখাপেক্ষী'।[৩]

যবানের অপব্যবহার :

(১) গালিগালাজ করা : অধিকাংশ মানুষ নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ বা যে কোনো কারণে ছোট-বড়, সাধারণ মানুষ, আলেম-ওলামা ইত্যাদির গালিগালাজ করাটাকে স্বীয় অভ্যাসে পরিণত করেছে। অথচ হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, 'দুইজন লোক একে অপরকে গালি দেওয়ার শাস্তি প্রথম গালি প্রদানকারীর উপর এসে পড়ে, যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্যাতিত ব্যক্তি (দ্বিতীয় ব্যক্তি) সীমালংঘন করে'।[৪] অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, 'কোনো মুসলিমকে গালি দেওয়া গুনাহর কাজ এবং তাকে হত্যা করা কুফরি কাজ'।[৫]

(২) মিথ্যা বলে মানুষকে হাসানো : আল্লাহর রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, 'ধ্বংস ওর! যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে। ধ্বংস ওর! ধ্বংস ওর জন্য'।[৬]

১. ছহীহ বুখারী, হা/৬০১৮।
২. জামে' তিরমিযী, হা/২৪০৬।
৩. আল-মু'জামুল কাবীর, হা/৮৭৪৪।
৪. তিরমিযী, হা/১৯৮১।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/৭০৭৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৮৭।
৬. মুসনাদে আহমাদ, হা/২০০২১।

(৩) অন্যকে লা'নত করা : কারো কারো মাঝে কথায় কথায় লা'নত বা বদদু'আ দেওয়ার বদাভ্যাস থাকে। বিশেষভাবে নারীদের মাঝে এ স্বভাব রয়েছে। অনেক সময় তারা আপনজন এমনকি নিজ সন্তানকেও বদদু'আ দিয়ে থাকে। হতে পারে তখন দু'আ কবুলের মুহূর্ত ছিল। ফলে খাল কেটে কুমির আনার মতো অবস্থা হয়। বদদু'আটা লেগে যায়। এটা খুবই গর্হিত কাজ। যবানের মারাত্মক অপব্যবহার। তাই এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, 'তোমরা একে অপরকে লা'নত করো না; বলো না, তোমার উপর আল্লাহর লা'নত হোক, তোমার উপর আল্লাহর গযব পড়ুক, তুমি জাহান্নামে যাও'।[৭]

(৪) অন্যের গীবত করা : যবানের অপব্যবহারের আরেকটি ক্ষেত্র হলো, গীবত বা পরনিন্দা করা। অথচ কুরআন-হাদীছে এগুলো থেকে শক্তভাবে বারণ করা হয়েছে। এগুলোর প্রত্যেকটাই কবীরা গুনাহ। পাশাপাশি যবানের অপব্যবহারেরও শামিল।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন, 'তোমরা একে অপরের গীবত (পরনিন্দা) করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দ করে থাকো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক তওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১২)*। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'গীবত (পরনিন্দা) যেনার (ব্যভিচার) চেয়ে জগন্য অপরাধ'।[৮]

(৫) মিথ্যা কথা বলা : আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যখন কোনো বান্দা মিথ্যা বলে, তখন এর দুর্গন্ধে ফেরেশতারা তার নিকট থেকে এক মাইল দূরে চলে যায়'।[৯]

(৬) শোনা কথা বলে বেড়ানো : আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে, তাই বলে বেড়ায়'।[১০]

(৭) ভালো-মন্দ বিচার না করেই কোনো কথা বলা : আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, 'বান্দা যখন ভালো-মন্দ বিচার না করেই কোনো কথা বলে, তখন সে নিজেকে এই কারণে জাহান্নামের এত গভীরে নিয়ে যায়, যা পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের সমান'।[১১]

(৮) দ্বি-মুখী আচরণ : আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'দ্বিমুখী চরিত্রের লোকেরা কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে গণ্য হবে'।[১২]

(৯) কথা দ্বারা অন্যকে কষ্ট দেওয়া : আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে একজন নারী সম্পর্কে বলা হলো, সে খুব নফল ছালাত পড়ে, ছিয়াম রাখে এবং অনেক দান-ছাদাক্বা করে। কিন্তু তার মুখের ভাষা প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে জাহান্নামী। ঐ ব্যক্তি আরেকজন নারী সম্পর্কে বলল, যার নফল ছালাত, নফল ছিয়াম ও দান-ছাদাক্বার ক্ষেত্রে তেমন প্রসিদ্ধি নেই। কখনো হয়তো সামান্য পনিরের টুকরা ছাদাক্বা করে। তবে সে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। কেউ তার মুখের ভাষায় কষ্ট পায় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে জান্নাতী।[১৩]

যবানের অপব্যবহারের পরিণাম :

যবানের অপব্যবহারের কারণে মানুষ যেমন সামাজিক অশান্তিতে থাকে তেমনি পরকালে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। দীর্ঘ এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, মুআয রাযিয়াল্লা-হু আনহু রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'কথার কারণেও কি আমাদের পাকড়াও করা হবে? (মুখের কথার কারণেও কি জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে?) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআয রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর উরুতে মৃদু আঘাত করে বললেন, হে মুআয! তুমি এ বিষয়টি বুঝ না! আরে, মানুষকে তো তার যবানের কারণেই মুখের উপর ভর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। যে আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে, সে যেন ভালো কথা বলে বা অন্তত মন্দ কথা থেকে বিরত থাকে। তোমরা ভালো কথা বলো, লাভবান হবে।

---

৭. জামে' তিরমিযী, হা/১৯৭৬।
৮. মিশকাত, হা/৪৮৭৪।
৯. সুনানে তিরমিযী, হা/১৯৭২।
১০. ছহীহ মুসলিম, হা/৭।
১১. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৭৭; ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৮৮।
১২. ছহীহ বুখারী, হা/৬০৫৮; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫২৬; মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৪১৯; সুনানে তিরমিযী, হা/১৯৭৪।
১৩. মুসনাদে আহমাদ, হা/৯৩৮৩; শু'আবুল ঈমান, হা/৯৫৪৬।

মন্দকাজ থেকে বিরত থাকো, নিরাপদে থাকবে।[১৪] অন্য এক হাদীছে এসেছে, রাসূল ﷺ বলেন, 'বান্দা চিন্তা-ভাবনা ছাড়া এমন কথা বলে ফেলে, যার কারণে সে (পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব পরিমাণ) জাহান্নামের অতলে নিক্ষিপ্ত হবে'।[১৫]

বহুক্ষেত্রে যবানের অপব্যবহার গভীর সম্পর্ককেও তছনছ করে দেয়। নিবিড় বন্ধুত্বের মাঝেও ফাটল ধরায়। দীর্ঘদিনের আত্মীয়তার সম্পর্ককে মুহূর্তে শেষ করে দেয়। হৃদয়কে জর্জরিত করে। অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত করে, যা কখনোও মানুষ ভুলতে পারে না। কারণ, যবানের আঘাতের ঘা শুকায় না। কবি বলেছেন, 'বর্শার ফলার আঘাতের উপশম হয়। তবে যবানের আঘাতের কোনো উপশম নেই'।[১৬]

যবানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা :

রাসূল ﷺ যবানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। কত পূত-পবিত্র তাঁর যবান! যে যবান আল্লাহর তরফ থেকে বান্দার কাছে অহি পৌঁছায় এবং আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা দান করে। এ যবানের পবিত্রতা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন, 'সে তার নিজ খেয়াল-খুশি থেকে কিছু বলে না'। এ তো অহি, যা তার কাছে পাঠানো হয়' *(আন-নাযম, ৫৩/৩-৪)*। তা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ বিনয়ের সাথে কাতর কণ্ঠে আল্লাহর কাছে যবানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, 'হে আল্লাহ! আমি আমার কান, চোখ, যবান, হৃদয় এবং লজ্জাস্থানের অনিষ্ট থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই'।[১৭] সুতরাং আমাদেরও উচিত যবানের সঠিক ব্যবহারের প্রতি সচেতন ও যত্নবান হওয়া এবং এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। আর পাশাপাশি নিজের যবানকে (এর অপব্যবহারের গুনাহ থেকে বাঁচতে চাইলে) নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে হবে। নিয়ন্ত্রণ করার অন্যতম মাধ্যমগুলো হলো, খারাপ লোকদের মজলিস পরিত্যাগ করা, আড্ডাবাজি ছেড়ে দেওয়া, চুপচাপ থাকা, বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করা ইত্যাদি।

এক হাদীছে এসেছে, জান্নাতীগণ জান্নাতে যাওয়ার পর কোনো জিনিসের জন্য আফসোস করবে না একটি মাত্র জিনিস ব্যতীত, তা হলো- আল্লাহ তাআলার যিকির। অর্থাৎ, জান্নাতীগণ জানাতে গিয়ে যখন দুনিয়াতে কৃত আল্লাহর যিকিরের ছওয়াব দেখবে, তখন তাদের মনে আফসোস থাকবে, যদি দুনিয়াতে একটা মুহূর্তও আমরা বিনা যিকিরে না কাটাতাম, তাহলে কতই না ছওয়াবের মালিক হতে পারতাম!

যবান হেফাযতের ফযীলত :

(১) নাজাত পাওয়া যায় : উক্ববা ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! নাজাত কিসে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি তোমার যবানকে হেফাযত করো, তোমার ঘর যেন তোমার জন্য যথেষ্ট হয়, তুমি তোমার ভুলের জন্য কান্না করো'।[১৮]

(২) সর্বোত্তম আমল : আবূ মুসা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, ছাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! ইসলামে কোন কাজ সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেন, যার জিহ্বা এবং হাত হতে অপর মুসলিম নিরাপদ থাকে।[১৯]

(৩) পাক্কা ঈমানদার হওয়া যায় : আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান পরিপক্ক হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত দিল (অন্তর) স্থির না হবে। আর দিল (অন্তর) স্থির হয় না যবান স্থির হওয়া ব্যতীত। যে ব্যক্তি থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[২০]

(৪) জান্নাত পাওয়া যায় : সুলায়মান ইবনু দাউদ আলাইহিস সালাম বলেন, কথা বলা যদি হয় রূপার মতো, তাহলে চুপ থাকা হবে স্বর্ণের মতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার কাছে তার দুই চোলায়ের মাঝে যা আছে অর্থাৎ জিহ্বা এবং তার দুই পায়ের মাঝে যা আছে অর্থাৎ লজ্জাস্থান হিফাযতের যিম্মাদার হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যিম্মাদার হব'।[২১]

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উপরিউক্ত আয়াত এবং হাদীছসমূহের ওপর আমল করার তাওফীক্ব দান করুন। যবানের অপব্যবহার পরিত্যাগ করে সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে নিজ নিজ যবান হেফাযত করার তাওফীক্ব দান করুন এবং সর্বদা যিকরে মশগূল থাকার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

১৪. মুসতাদরাক হাকেম, হা/৭৭৭৪।
১৫. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৭৭।
১৬. শরহে জামে', 'কালেমা'-এর আলোচনায় দ্রষ্টব্য।
১৭. সুনানে আবূ দাউদ, হা/১৫৫১; জামে' তিরমিযী, হা/৪৯২।
১৮. তিরমিযী, হা/২৪০৬; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭৩৭২; আত-তারগীব, হা/২৭৪১।
১৯. ছহীহ বুখারী, হা/১০।
২০. মুসনাদে আহমাদ, হা/১৩০৭১; সিলসিলা ছহীহা, হা/২৮৪১; আত-তারগীব, হা/২৫৫৪।
২১. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৬।

মনীষীদের অন্তরে মৃত্যুভয়

-আব্দুল বাছীর বিন আলম*

নিশ্চয়ই জেনে রাখো! দুনিয়ার মায়ায় মত্ত ব্যক্তি, দুনিয়ার ধোঁকার অধোগামী ব্যক্তি, দুনিয়ার কামনা-বাসনার প্রতি আসক্ত ব্যক্তি তার অন্তরকে মৃত্যু থেকে গাফেল করে রাখে। মৃত্যুকে স্মরণ করার কোনো উপায় নেই তার; তাই সে স্মরণও করে না। তার নিকট মৃত্যুর কথা উপস্থাপন করা হলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পালিয়ে বেড়ায়। তবে আমাদের চেয়ে বহুগুণ উত্তম ইসলামী মনীষীগণ, যারা ঈমান-আমলে ছিলেন আমাদের থেকে বহু অগ্রগামী। তবুও তারা ছিলেন মৃত্যুর ভয়ে সর্বদা শঙ্কিত।

প্রিয় পাঠক! একটু জেনে নিই সে সকল মনীষী মৃত্যুটাকে কেমন মনে করতেন।

১. ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) তার সহপাঠীকে লক্ষ্য করে বলেন, তুমি মৃত্যুকে স্মরণ করো বেশি বেশি। যদি তুমি দুনিয়ায় স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনকারী হও, তবে মৃত্যুকালটা তোমার জন্য হবে খুবই সংকীর্ণ। আর যদি তুমি নীরস জীবনযাপনকারী হও, তবে তোমার মৃত্যুকালটা হবে স্বাচ্ছন্দ্যময়।

২. ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) প্রতি রাতে ফক্বীহদেরকে একত্রিত করতেন, অতঃপর তারা মৃত্যু, ক্বিয়ামত এবং আখিরাতের কথা স্মরণ করতেন। আর তারা এমনভাবে ক্রন্দন করতেন, যেন তাদের সামনে কোনো জানাযা/লাশ উপস্থিত।

৩. রবী‘ ইবনে খায়ছাম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, মৃত্যুর চেয়ে কল্যাণকর অদৃশ্য বিষয় আর কী হতে পারে, যার অপেক্ষা মুমিনগণ করেন।

৪. রবী‘ ইবনে খায়ছাম (রাহিমাহুল্লাহ) তার ঘরে একটি কবর খুঁড়েছিলেন। আর অধিকাংশ সময় তিনি তাতেই ঘুমাতেন ও মৃত্যুর কথা স্মরণ করতেন এবং বলতেন, যদি আমার অন্তর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও মৃত্যুর ভয় দূর হয়ে যায়, তাহলে আমার অন্তর নষ্ট হয়ে যাবে।

৫. কা‘ব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, যে ব্যক্তি মৃত্যু কী জিনিস তা বুঝতে পারে, তার উপর দুনিয়ার বালা-মুছীবত ও দুশ্চিন্তা সহজ হয়ে যায়।

৬. ইবরাহীম তায়মী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, দু’টি জিনিস আমার থেকে দুনিয়ার স্বাদ নিঃশেষ করে দিয়েছে- (ক) মৃত্যুর স্মরণ এবং (খ) মহান প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া।

৭. মুতাররিফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, নিশ্চই এই মৃত্যু ভোগ-বিলাসীদের বিলাসিতাকে বন্ধ করে দেয়। কাজেই তোমরা এমন নিয়ামত/ভোগ-বিলাস অনুসন্ধান করো, যাতে কোনো মরণ নেই।

৮. কতক বিদ্বান তাদের ভাইদের নিকটে এ বলে চিঠি লেখেন যে, হে ভাই! তুমি তোমার এই ঘরে মৃত্যু থেকে সতর্কতা অবলম্বন করো এমন এক ঘরে স্থানান্তরিত হবার পূর্বে, যেখানে তুমি মৃত্যু কামনা করবে কিন্তু তুমি তা পাবে না।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! ধোঁকার দুনিয়া ছেড়ে পরকালমুখী হোন! আজই পাপের তওবা করে নিন! হতে পারে এমন এক সময় আসবে, তওবা করারও সুযোগ থাকবে না। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একটি হাদীছ স্মরণ করেই শেষ করছি, একদা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইবনু ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন, তুমি যখন সকাল করবে, তখন সন্ধ্যার আশা করবে না। আর যখন সন্ধ্যা করবে, তখন সকালের আশা করবে না। আর মৃত্যুর পূর্বেই তোমার জীবনকে কাজে লাগাও। কাজে লাগাও অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে। কেননা হে আল্লাহর বান্দা! তুমি জানো না আগামীকাল তোমার কী নাম হবে! (মানুষ না লাশ)।

ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।[১]

* অধ্যয়নরত, মাদরাসা দারুল হাদীস সালাফিইয়াহ, পাঁচরুখী, নারায়ণগঞ্জ।

১. ইহ্ইয়া উলূমিদ দ্বীন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৭৭-৪৭৯।

www.al-itisam.com

প্রকৃত জ্ঞানীর বৈশিষ্ট্য

[৯ জুমাদাল আখেরাহ, ১৪৪২ হি. মোতাবেক ২২ জানুয়ারি, ২০২১। পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারার (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন ***শায়খ ড. আহমাদ ইবনু হুমাইদ (হাফি.)****। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহীর সম্মানিত সিনিয়র শিক্ষক ও 'আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ'-এর গবেষণা সহকারী* ***শায়খ আব্দুল কাদের বিন রইসুদ্দীন।*** *খুৎবাটি* ***'মাসিক আল-ইতিছাম'****-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমুন্নত, ক্ষমতাবান, মুমিনদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী। তার মতো কেউ নেই, তার সমকক্ষ কেউ নেই, তিনি অনন্য। 'তিনি সবকিছু শুনেন এবং দেখেন' *(আশ-শুআরা, ২৬/১১)*। আমি তার প্রশংসা করছি তার কৃতজ্ঞ বান্দাদের প্রশংসার ন্যায়, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তাকে স্মরণকারী বান্দাদের কৃতজ্ঞতার ন্যায় এবং স্মরণ করছি তাকে তাওহীদবাদীদের স্মরণের ন্যায়। 'আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা এবং বড় পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন' *(আল-আহযাব, ৩৩/৩৫)*। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তার রুবূবিয়্যাত সম্পর্কে জ্ঞাত, ওয়াহদানিয়্যাত সম্পর্কে পরিচিত ও তার ইবাদতে বিনয়ী ব্যক্তির ন্যায় এই মর্মে যে, এক আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো উপাস্য নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নেতা নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তাকে তিনি সৃষ্টির সেরা এবং বন্ধু হিসাবে বিশেষিত করেছেন। তাকে তিনি অহীর জন্য মনোনীত করেছেন। তার মাধ্যমেই নবীগণের আগমনী ধারা মোহরাঙ্কিত করেছেন। তাকে পাঠিয়েছেন তিনি জগতবাসীর জন্য রহমতরূপে, সত্যান্বেষীদের পথপ্রদর্শকরূপে, সত্যের নিদর্শন ও সত্য পথের দ্যুতিরূপে।

হে বিশ্বাসীগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে থেকে মুমিন বান্দাদের মধ্য থেকে তাদেরকে বাছাই করেছেন, যারা তার সম্পর্কে ও তার নির্দেশ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। আর যারা তাদের পথ পরিহার করবে, তাদের পথ থেকে বিচ্যুত হবে, তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি জানে যে হক্ব আপনার রবের কাছ থেকে আপনার কাছে অবতীর্ণ হয়, সে কি তার মতো যে অন্ধ? বস্তুত জ্ঞানীরাই উপদেশ গ্রহণ করে। প্রকৃত জ্ঞানী তারাই যারা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করে না। আর যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে, যার আদেশ আল্লাহ করেছেন; যারা তাদের রবকে ভয় করে, মন্দ হিসাবের ভয় করে; যারা তাদের রবের সন্তুষ্টির সন্ধানে ধৈর্যধারণ করে, ছালাত আদায় করে, আমার দেওয়া রিযিক্ব থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, মন্দের প্রত্যুত্তর করে ভালোর মাধ্যমে; তাদের জন্য রয়েছে পরকালীন আবাস (জান্নাত)। স্থায়ী বসবাসের জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান সন্ততিদের মধ্যে থেকে যারা নেক আমল করেছে তারাও প্রবেশ করবে। ফেরেশতারা তাদের (অভ্যর্থনা জানানোর জন্য জান্নাতের) প্রতিটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবে, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! যেহেতু তোমরা (দুনিয়ায়) ধৈর্যধারণ করেছিলে। কতই না উত্তম পরকালীন আবাস! আর যারা আল্লাহকে দেওয়া ওয়াদা ভঙ্গ করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার যে আদেশ আল্লাহ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং মন্দ আবাস (জাহান্নাম)' *(আর-রা'দ, ১৩/১৯-২৫)*।

অতএব, ইসলাম বুঝার জন্য আল্লাহ যার বক্ষকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন, হৃদয়কে ঈমানের নূর দ্বারা আলোকিত করেছেন, সে সর্বদা আল্লাহর সীমারেখা হেফাযত ও নবী করীম ﷺ -এর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে জ্ঞানীদের মানহাজ আঁকড়ে ধরে। যে পথের দিকে মহান আল্লাহ তার মুত্তাক্বী বান্দাদের আহ্বান করে বলেন, 'এটা হচ্ছে আমার সরল পথ। তোমরা তা অনুসরণ করো, এ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করো না। কেননা তা (ভিন্ন পথ অবলম্বন) তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। এ ব্যাপারেই তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে তোমরা মুত্তাক্বী হতে পার' *(আল-আনআম, ৬/১৫৩)*।

যারা প্রকৃত জ্ঞানী তারা তাদের রবের কাছে কামনা করে বলে, 'আপনি আমাদের সরল পথ দেখান, তাদের পথ যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন' *(আল ফাতিহা, ০৬)*। ফলে মহীয়ান গরীয়ান মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নেয়াতমপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তারা হচ্ছেন, নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও নেককার বান্দাগণ *(আন-নিসা, ৪/৬৯-৭০)*।

যারা জ্ঞানী তারা আল্লাহর অবাধ্যতার চেয়ে আনুগত্যকে প্রাধান্য দেয়, মূর্খতার উপর জ্ঞান প্রাধান্য দেয়, দ্বীনকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয়। সুতরাং জ্ঞান তাদের সৌন্দর্য, প্রজ্ঞা তাদের সম্মান, সম্মান তাদের পূর্ণতা। তারা সকল সৃষ্টি থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহর দরবারে কড়া নাড়ে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহই হলেন অমুখাপেক্ষী এবং প্রশংসিত' *(ফাত্বির, ৩৫/১৫)*।

দ্বিতীয় খুৎবা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং যিনি নেককার লোকদের অভিভাবক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো উপাস্য নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নেতা নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাকে জগতবাসীর জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছেন।

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি একদা রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী আমার খালা মায়মূনার ঘরে রাত কাটালাম। আমি বিছানায় বালিশের পাশে আড়াআড়ি হয়ে শুইলাম এবং আমার খালা ও রাসূল ﷺ লম্বালম্বি হয়ে শুইলেন। রাসূল ﷺ অর্ধরাত্রি অথবা এর কিছু কম অথবা বেশি সময় পর্যন্ত ঘুমালেন। তারপর তিনি ঘুম থেকে উঠে বসে হাত দ্বারা মুখ রগড়িয়ে ঘুমের ভাব দূর করতে লাগলেন। তারপর তিনি সূরা আলে ইমরানের শেষ ১০ আয়াত পাঠ করে মশকের কাছে গিয়ে পানি নিয়ে ভালোভাবে ওযূ করলেন। অতঃপর ছালাত আদায় করলেন।[১] উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি রাসূল ﷺ এর সবচেয়ে আশ্চর্যকর কোন বিষয়টি দেখেছেন? তিনি প্রশ্ন শুনে চুপ হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, কোনো এক রাতে তিনি আমাকে বললেন, আয়েশা! আজ রাতে আমাকে তুমি আমার রবের ইবাদত করার জন্য ছেড়ে দাও। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি আপনার সঙ্গ পেতে ভালোবাসি এবং আপনাকে যা আনন্দ দেয় সেটাও ভালোবাসি। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, অতঃপর তিনি উঠে পবিত্র হয়ে ছালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। ছালাতে তিনি এত অধিক পরিমাণে কাঁদলেন যে, তার দাঁড়ি ও বুক ভিজে গেল; শেষ পর্যন্ত যমীনও ভিজে গেল। অতঃপর বেলাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু (ফজরের) ছালাতের আযান দেওয়ার জন্য আসলেন। তাকে কাঁদতে দেখে বললেন, আপনি কাঁদছেন কেন? আপনার তো পূর্বাপর সকল গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? আজ রাতেই আমার কাছে কিছু আয়াত নাযিল হয়েছে। ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি! যে এই আয়াতগুলো পাঠ করল অথচ তা নিয়ে গবেষণা করল না। এ কথা বলে তিনি এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, 'নিশ্চয়ই আসমান-যমীনের সৃষ্টির মধ্যে দিন এবং রাতের পরিবর্তনের মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে, আসমান-যমীনের সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে আর বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! এগুলো আপনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আপনি সকল দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। সুতরাং আপনি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। প্রতিপালক! আপনি যাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন, তাকে বেইজ্জতি করে ছাড়বেন। আর যারা যালেম তাদের জন্য তো কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। প্রতিপালক! আমরা একজন ঘোষণাকারীকে এই ঘোষণা করতে শুনেছি যে, তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনো। তাই আমরা ঈমান এনেছি। প্রতিপালক! অতএব, আপনি আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিন, আমাদের আমলনামা থেকে আমাদের অপরাধসমূহ মুছে দিন, নেককার লোকদের সাথে আমাদের মৃত্যু দান করুন। প্রতিপালক! আপনি আপনার রাসূলের মাধ্যমে যেসব প্রতিশ্রুতি আমাদের দিয়েছেন, তা আমাদের দান করুন। আর কিয়ামতের দিন আমাদের অপমানিত করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি ওয়াদা খেলাফ করেন না। অতঃপর তাদের রব তাদের ডাকে এই বলে সাড়া দিলেন যে, তোমাদের মধ্যে থেকে নারী হোক অথবা পুরুষ হোক কোনো আমলকারীর আমল আমি বিনষ্ট করব না। তোমরা একে অপরের মতো। অতঃপর যারা হিজরত করেছে (নিজেদের দেশ ত্যাগ করেছে), যাদেরকে নিজেদের জন্মভূমি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, আমার পথে যারা নির্যাতিত হয়েছে, যারা আমার পথে লড়াই করেছে এবং শহীদ হয়েছে, অবশ্যই আমি তাদের থেকে তাদের গুনাহ মাফ করে দিব এবং তাদের এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব যার তলদেশ দিয়ে ঝরনাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে। এটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার। আর আল্লাহর কাছেই আছে উত্তম পুরস্কার। (হে মুহাম্মাদ), দেশে দেশে, জনপদে যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে তাদের (দাম্ভিকতাপূর্ণ) পদচারণা আপনাকে যেন ধোঁকায় ফেলে না দেয়।

[বাকী অংশ ৩৩ নং পৃষ্ঠায়]

১. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৩; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৬৩; মুসনাদে আহমাদ, হা/২১৬৪।

জেলখানায় অপরাধ প্রবণতা : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রস্তাবনা

-জুয়েল রানা*

পরিচিতি : Prison বা Jail বাংলায় কারাগার, বন্দিশালা, জেলখানা ও কয়েদখানা নামে পরিচিত। কারাগার বলতে সবার মনে দুঃখ-কষ্টে ভরা পরাধীনতার এক করুণ দৃশ্য ভেসে ওঠে। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অপরাধীদের আটকে রাখতে কারাগারের উৎপত্তি।

জেলখানায় নারীসঙ্গ : সম্প্রতি হলমার্ক কেলেঙ্কারির অন্যতম হোতা তুষারের ঘুষের বিনিময়ে কারাগারে নারীসঙ্গ নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেওয়া শুরু হয়েছে।[২] অনৈতিক লেনদেনের বিনিময়ে প্রচলিত আইন অমান্য করে নারীসঙ্গ নিয়ে যে সমালোচনা হচ্ছে, তা যথার্থ।

পত্রিকান্তরে প্রকাশ, হলমার্ক কেলেঙ্কারি মামলার অন্যতম আসামি হলমার্কের মহাব্যবস্থাপকের সাথে বহিরাগত এক নারীকে ৪৫ মিনিট অবস্থান করার সুযোগ দিয়েছে কারাগার কর্তৃপক্ষ। কারাগারের সিসিটিভি ক্যামেরায় ধারণকৃত এ ভিডিও চিত্রটি একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হলে তা ভাইরাল হয়ে যায়।

পরিবারের সঙ্গে বন্দীর সাক্ষাৎ : ইমাম মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়দের বন্দির সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়া কোনোভাবেই উচিত নয়'। বন্দিদের শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা ইসলামী আইনজ্ঞদের মতে অন্যায়। নির্যাতনের কারণে কোনো বন্দির মৃত্যু হলে তা ইচ্ছাকৃত হত্যা বলে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকেও 'ক্বিছাছ' (হত্যার বদলা)-এর ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। নানা কারণে নারীরাও বন্দি হয়েছে। তাই ইসলামী ইতিহাসের সূচনাকাল থেকেই কারাগারে নারীদের জন্য পৃথক থাকার ব্যবস্থা ছিল। নারীদের পৃথক ব্যবস্থার প্রতি মুসলিম আইনবিদগণ বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। নারী বন্দিদের দায়িত্বেও একজন নারী দায়িত্বশীল নিয়োগের নির্দেশনা দিয়েছেন তাঁরা।

বছরের পর বছর বিচারে বা বিনা বিচারে বন্দিরা কারারুদ্ধ থাকে। বিবাহিত নারী বা পুরুষ সকলের জন্য এটা শরীআতের দৃষ্টিকোণ থেকে ও মানবিক বিচারে অন্যায়। বিবাহযোগ্য নারী-পুরুষদের জন্যও এটা সমস্যা। বন্দিদেরকে পরিবার থেকে এভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখা শরীআতের দৃষ্টিতে অবৈধ। এ কারণে সমকামিতা ও মাদকাসক্ত হওয়ার মতো জটিল অপরাধ ও সমস্যার উদ্ভব ঘটছে।[৩]

বন্দি অভিযুক্ত কিংবা দোষী সাব্যস্ত যা-ই হোন না কেন, মৌলিক মানবিক অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা যাবে না। এ নিয়ে কারো দ্বিমত নেই। ইসলামিক স্কলাররা মনে করেন, বিবাহিত বন্দির নৈতিক ও চারিত্রিক অধপতন রোধ এবং মানসিক বিকাশের প্রয়োজনে স্ত্রীর সম্মতি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট জেলকোড ও শর্তাবলী অনুসরণ করে নির্ধারিত বিরতিতে স্ত্রীর সঙ্গে একান্তে সময় কাটানোর সুযোগ থাকা উচিত। এর অন্যতম একটি কারণ হলো, স্বামীর অপরাধের কারণে স্ত্রীকে জৈবিক প্রয়োজন মেটানোর অধিকার থেকে বঞ্চিত করা আদৌ ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা, মানব ইতিহাসের অন্যতম ন্যায়বিচারক ও আদর্শ শাসক উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বন্দিদের স্ত্রীর সঙ্গে একান্তে সাক্ষাতের সুযোগ দিতেন।

ইসলামের ইতিহাসের বেশিরভাগ ইমাম ও স্কলার যেমন ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ও ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুমুল্লাহ-এর মতে, বন্দিকে নির্দিষ্ট শর্ত ও জেলকোড মেনে এবং স্ত্রীর সম্মতিসাপেক্ষে স্ত্রীর সঙ্গে একান্তে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া উচিত। বন্দি যদি নারী হন, তবে সেক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সঊদী আরবসহ পৃথিবীর বহু দেশে এ নিয়ম পুরোপুরি প্রচলিত আছে। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, স্পেনসহ অনেক দেশে এ নিয়ম আছে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের ২০১৫ সালের একটি রায়ের পর থেকে ভারতে এ

* খত্বীব, গছাহার বেগ পাড়া জামে মসজিদ (১২ নং আলোকডিহি ইউনিয়ন), গছাহার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর; সহকারি শিক্ষক, চম্পাতলী জান্দি পাড়া ইসলামিক একাডেমি, চম্পাতলী বাজার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

১. https://www.bangla.24livenewspaper.com/bangladesh/74515-three-withdrawn-from-kashimpur-jail.

২. মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক, কারাগার থেকে বলছি (ঢাকা : বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ-সেপ্টেম্বর ২০১৩), পৃ. ১৪৩-১৪৪।

নিয়ম চালু আছে। তুরস্কে কোনো কয়েদীর আচরণ সুন্দর, শৃঙ্খলা উত্তম এবং সর্বোপরি সার্বিক পারফরমেন্স ভালো হলে তাদের এ সুযোগ দেওয়া হয়। এতে বন্দির মানসিক বিকাশ ও চিন্তাগত সুস্থতার পথ সুগম হয় এবং চারিত্রিক স্খলনের পথ রুদ্ধ হয়। কেউ বলতে পারেন, জেলে এ সব সুবিধা থাকলে আর বন্দিত্বের মানে কী থাকে? এর উত্তর হলো, বন্দিত্ব একটি সাজা। একজন বন্দির সাজাভোগের পাশাপাশি মৌলিক মানবিক প্রয়োজনগুলো পূরণের সুযোগ যেমন দূষণীয় নয়, তেমনি এটি দোষেরও নয়। বিশেষ করে এর সঙ্গে যেহেতু অন্যের অধিকার জড়িত। জেলে সন্তানাদি ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ যেমন ন্যায্য, এটিও তেমন ন্যায্য। সেই সঙ্গে বন্দিদের মানসিক ও আদর্শিক পরিচর্যার প্রয়োজনে প্রতিটি জেলখানায় ইসলামিক আলোচনা ও মোটিভেশনাল বক্তব্যের ব্যবস্থা থাকা উচিত। কারণ বন্দিজীবনের অবসরে মানুষ সবচেয়ে বেশি চিন্তা-ভাবনা ও আত্মশুদ্ধির সুযোগ পায়। বাংলাদেশে এ নিয়মের ব্যবস্থা যথাযথভাবে করা হলে বন্দিদের মানসিক বিকাশ ও সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পথ সুগম হবে এবং দেশে অপরাধ প্রবণতা কমে আসবে ইনশা-আল্লাহ।

ফিরে দেখা : বাংলাদেশে কারাগারের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অপরাধটি ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঘটেছিল। সেদিন কারাগারে জাতীয় চার নেতাকে খুন করা হয়। উচ্চ আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া এই মামলার দলীলপত্র বলছে, চার নেতাকে খুনের আগে এক জায়গায় নিয়ে আসার কাজটি করেছিলেন জেলখানার লোকজনই।

মাত্র ছয় মাস আগে গাজীপুরের কাশিমপুর-২ কারাগার থেকে দিন-দুপুরে মই নিয়ে সীমানা প্রাচীর পেরিয়ে বেরিয়ে যান আবু বকর ছিদ্দিক নামের এক কয়েদি। ওই সময় ১২ জনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয় কারা কর্তৃপক্ষ। ছয় মাস যেতে না যেতেই কাশিমপুর-১ কারাগারে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে বাইরের এক নারীর সঙ্গে এক বন্দির অন্তরঙ্গ সময় কাটানোর সুযোগ হয়। এ নিয়ে আলোচনার ঘূর্ণি উঠেছে দেশজুড়ে। বলা চলে, পুরো কারাগারব্যবস্থাই দুর্নীতির কারণে অরক্ষিত হয়ে আছে।

জানা গেছে, কারাগারের অনেক কর্মকর্তা ও রক্ষী মাদক কারবারে জড়িত। তাঁদের বিরুদ্ধে ক্যান্টিনের খাবার ও দর্শনার্থী নিয়ে বাণিজ্য, বন্দিদের নির্যাতন করে অর্থ আদায়, বন্দিদের মোবাইল ও ল্যাপটপ ব্যবহার করতে দেওয়াসহ নানা অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ দীর্ঘ দিনের। কারাগারগুলোকে অনিয়মের আখড়া বানিয়ে কারা কর্মকর্তারা গড়ছেন অবৈধ সম্পদের পাহাড়। বস্তাভরা টাকা নিয়ে ধরাও পড়েছেন ঊর্ধ্বতন কয়েকজন কারা কর্মকর্তা। তাদের বিচার চলছে। কিন্তু থেমে নেই টাকার বিনিময়ে অপরাধ করার সুযোগ দেওয়া। সর্বশেষ 'হলমার্ক' কেলেঙ্কারির কারাবন্দি তুষার আহমেদের কাশিমপুর-১ কারাগারে এক নারীর সঙ্গে একান্তে সময় কাটানোর বিষয়টি কারাগারে ভয়াবহ অনিয়মকে সামনে এনেছে।

কারা সূত্রে জানা গেছে, গত তিন বছরে শতাধিক কারা কর্মকর্তা ও রক্ষীকে অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এরপরও উন্নতি হয় নি। আরেক হিসাবে দেখা গেছে, গত তিন বছরে শতাধিক কারা কর্মকর্তা ও কারারক্ষীকে শাস্তির আওতায় আনা হয়েছে। এরপরও কমছে না অপরাধ। ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে কাশিমপুর হাই সিকিউরিটিজ কেন্দ্রীয় কারা ক্যাম্পাসে মাদক সেবন ও বিক্রির অভিযোগে পলাশ হোসেন (৩০) নামের এক কারারক্ষীকে হাতেনাতে আটক করা হয়। ঘটনার পর থেকে অন্য দুই কারারক্ষী পলাতক। একই বছর ২১ সেপ্টেম্বর মাদক কারবার ও সেবনের অভিযোগে হাই সিকিউরিটিসহ কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ ও ২-এর পাঁচ কারারক্ষীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। এর মধ্যে চারজনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা ও একজনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা হয়। ২০১৮ সালের মে মাসে কর্মকর্তা ও কারারক্ষী মিলিয়ে অন্তত ৭০ জনের বিরুদ্ধে মাদকসংশ্লিষ্টতার অভিযোগ পাওয়া যায়। এর মধ্যে তিনজনকে চাকরিচ্যুত এবং দুজনকে শাস্তিমূলক বদলি করা হয়। ২০১৮ সালের মার্চ মাসে মাদকের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে বরিশাল কারাগারের চার রক্ষীকে বরখাস্ত করা হয়।

উদাহরণ হয়ে আছে আলোচিত নেতা আবু তাহেরের পুত্র এ এইচ এম আফতাব উদ্দিন বিপ্লবের লক্ষ্মীপুর কারাগারের ভেতরে ঘটা করে গায়েহলুদ ও বিয়ে। ২০১৪ সালের ১ আগস্টের সেই ঘটনায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

সম্প্রতি বিতর্কিত একটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বেসামরিক সরকার ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে উত্তেজনা বাড়ার পর সুচিকে

গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠিয়েছে মিয়ানমার সেনাবাহিনী।[৪] উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের উপর সেনাবাহিনীর নির্যাতন শুরু হলে লাখ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আশ্রয় নেয়। কিন্তু মিস সুচি ধর্ষণ, হত্যা এবং সম্ভাব্য গণহত্যা রুখতে কোনো পদক্ষেপ নেননি এবং ক্ষমতাধর সামরিক বাহিনীর নিন্দা কিংবা তাদের নৃশংসতার মাত্রাও স্বীকার করেননি। তবে ২০১৯ সালে হেগে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে অনুষ্ঠিত শুনানিতে সামরিক বাহিনীর পদক্ষেপের বিষয়ে তার নিজের স্বপক্ষে উপস্থাপিত যুক্তি মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এরপর তার আন্তর্জাতিক সুনাম বলতে তেমন কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

কারাগারে অনিয়ম ও দুর্নীতি : মানুষ সমাজেই পরিশুদ্ধ অবস্থায় থাকবে, দুর্নীতি করবে না, অন্যায় করবে না, অবিচার করবে না- এটেই প্রত্যাশিত। তবে শেষ পর্যন্ত সেটা হয় না। তাই সমাজে কেউ যদি দুর্নীতি করে ফেলে, তাহলে তাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য নেওয়া হয় কারাগারে। কিন্তু আমরা এখন উল্টো চিত্র দেখছি...। সমাজে যেসব কাজে দুর্নীতি নেই, কারাগারে সেসব কাজেও দুর্নীতি চলে। স্বাভাবিক জীবনে একজন অসুস্থ ব্যক্তির ওষুধ কিনতে কাউকে বখরা দিতে হয় না। কিন্তু কারাগারে নাকি একটা প্যারাসিটামল পেতেও কাউকে না কাউকে বখরা দিতেই হবে। আপনি যামিন পেয়েছেন, কারামুক্তি পাবেন, সেখানেও দিতে হয় বখরা। যিনি জীবনে এক টাকা ঘুষ দেননি, তাকেও নাকি কারাগারে গেলে ঘুষ দিতে হয়। এই যদি হয় অবস্থা, তাহলে একজন অপরাধীকে পরিশুদ্ধ করে সমাজে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজটি কীভাবে হবে? পরিশুদ্ধির জায়গা কারাগারে বন্দিকে যদি প্রতিনিয়ত নতুন নতুন দুর্নীতির মাঝ দিয়ে যেতে হয়, তাহলে পরিশুদ্ধির কাজটা হবে কীভাবে? যেখানে সমাজের দুর্নীতিবাজদের পরিশুদ্ধ করতে কারাগারে নেওয়া হয়, সেখানে কারাগারের দুর্নীতিবাজদের কোথায় নেওয়া হবে?

১৯৬৬ সালে ৬ দফা দেওয়ার পর অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হন। ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তিনি বন্দি থাকেন। ঐ সময় বন্দি থাকা অবস্থায় তিনি কারাগারে প্রতিদিনের ডায়েরি লেখা শুরু করেন। তিনি জেলখানার ভেতরে অনেক কথা লিখেছিলেন। তার মধ্যে একটা লেখার নাম দিয়েছিলেন, 'থালা বাটি কম্বল, জেল খানার সম্বল'।[৫]

কিন্তু সেদিনের জেলখানা আর এখনকার জেলখানা এক নয়। লোকে বলে, 'টাকা' নাকি সেকেন্ড গড (!)। কেউ কেউ বলেন, 'টাকা হলে নাকি বাঘের চোখ পাওয়া যায়'। টাকায় কী না হয়? এটাই মানুষের ধারণা। সমাজের বিত্তশালী লোকদের সবাই সমীহ করে। সংশ্লিষ্ট লোকেরা কীভাবে বিশাল টাকাওয়ালা বা বিত্ত-বৈভবের মালিক হলো কেউ তার খোঁজ নিতে যায় না। টাকার কাছে নৈতিকতার কোনো মূল্য নেই। বর্তমানে সমাজে একজন চরিত্রবান মানুষের কোনো মূল্য নেই, যদি তার টাকা না থাকে। সমাজ তার নিজস্ব রূপচরিত্র বদলে ফেলেছে। টাকার কাছে 'সমাজ' নির্বিকার হয়ে যাচ্ছে। নিরাপত্তার প্রশ্নে 'কারাগার' সবচেয়ে দুর্গম এলাকা হওয়ার কথা, যেখানে হাজতি বা কয়েদি এবং কারারক্ষী ছাড়া অন্য লোকের প্রবেশের ন্যূনতম সুযোগ থাকার কথা নয়। কিন্তু টাকা হলে বাংলাদেশের যেকোনো জেলখানায় নারীসঙ্গ থেকে শুরু করে কারাগার কর্তৃপক্ষ সব কিছুরই ব্যবস্থা করে দেয়। অর্থের পরিমাণ বেশি হলে কারাগার থেকে বাড়িতে গিয়ে দু-এক রাত কাটানোর ইতিহাসও রয়েছে।

ইসলামে বন্দীদের মর্যাদা : ইসলাম বন্দীদের সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বন্দীদের সাথে কোমল ব্যবহার করার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। বদর যুদ্ধের বন্দীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার জন্য তিনি ছাহাবীদের নির্দেশ দেন। অসুস্থ বন্দীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে তাগিদ দেন। ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী বন্দীদের এমন স্থানে রাখতে হবে, যেখানে তারা জীবনের নিরাপত্তাবোধ করবে। কেননা বন্দীদের আটকের উদ্দেশ্য হলো মানব মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে তাদের সংশোধন করা ও সমাজের কল্যাণে প্রস্তুত করা। শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'শরীআতের দৃষ্টিতে কয়েদিকে নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন জায়গায় আটক রাখবে, যেখানে তার ব্যক্তিগত কোনো শক্তি প্রয়োগের সুযোগ থাকবে না। চাই সে বন্দিত্ব ঘরে, মসজিদে কিংবা কারাগারে হোক'।[৬] রাসূল ﷺ বন্দীদের রাখার জন্য প্রশস্ত ও আলো প্রবেশ করে এমন তাঁবু নির্বাচন করতেন। যাতে বন্দীরা শারীরিক ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ করে। আধুনিক যুগে এ ধরনের কারাগারকে

৩. বিবিসি বাংলা, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২১।

৪ শেখ মুজিবুর রহমান, কারাগারের রোজনামচা (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ- মার্চ ২০১৭), পৃ. ২৫।

৫. মাজমূউল ফাতাওয়া, ৩৫/৩৯৮।

উন্মুক্ত কারাগার হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়, যাতে কয়েদিদের জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করে।[৭]

প্রস্তাবনা : বন্দীদেরকে স্ব স্ব ধর্মীয় মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। কারাগারে জুমআ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অথবা প্রতি ওয়ার্ডে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ও জুমআর ছালাতের ব্যবস্থা করতে হবে। দুই ঈদে সকল বন্দীকে অন্তত তিন ঘণ্টার জন্য খোলামেলাভাবে একত্রিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। জুমআ ও ঈদে বাহির থেকে যোগ্য আলেম এনে বন্দীদের সামনে কুরআন ও হাদীছ থেকে আখেরাত ভিত্তিক উপদেশ দিতে হবে। নিরক্ষর বন্দীদের দ্রুত অক্ষর জ্ঞান, প্রাথমিক ধর্মীয় জ্ঞান ও গণিত ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন করে তোলার ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রতিদিন বাদ ফজর ও বাদ এশা প্রতি কক্ষে দারসে কুরআন ও দারসে হাদীছের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বন্দীদের মধ্য থেকেও যোগ্য ব্যক্তিদের এ কাজে লাগানো যেতে পারে। এতে করে অপরাধীরা সংশোধন হয়ে ভালো মানুষে পরিণত হয়ে যাবে ইনশা-আল্লাহ। সেই সাথে সংশোধিত বন্দীদের বন্দীত্বের মেয়াদ ক্রমান্বয়ে হ্রাস করার বিধান রাখতে হবে। গণমাধ্যমে প্রকাশ, মুসলিমদের মানবিক শিক্ষায় অভিভূত হয়ে গত ২০২০ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২৭ জন কারাবন্দী ইসলাম গ্রহণ করেছেন। নওমুসলিমরা এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশোনা করে জ্ঞান অর্জনের পর স্বতস্ফূর্তভাবে মুসলিম হয়েছেন।

৬. ছহীহ ইবনু খুযায়মা, ২/২৮৫; হুকূকুল মাসজুন ফিশ শরীআতিল ইসলামিয়া, পৃ. ৫৪।

তারা জানান, মুসলিমদের সুন্দর আচার-ব্যবহার ও ইসলাম বিষয়ক মৌলিক জ্ঞান সম্পর্কিত কিছু কোর্স সম্পন্ন করে ইসলাম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু করি। এরপর আমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেই। আল-খায়মাহ কারাগার জানায়, পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণমূলক প্রোগ্রাম থেকে অনেক কয়েদি উপকৃত হয়েছে।[৮] 'আসামী' পরিভাষা বাতিল করে হাজতীদের জন্য 'বন্দী' ও দণ্ডপ্রাপ্তদের জন্য 'কয়েদী' পরিভাষা চালু করা হৌক। সেই সাথে মুসলিমকে হেয় করার জন্য সাদা টুপি ও জামা পরার প্রচলিত কয়েদী পোশাক বাতিল করতে হবে। কেবল প্রথম শ্রেণি প্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা বা মন্ত্রী-এমপি নয়, বরং সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন আলেম-ওলামা ও অন্যদেরকে কারাগারে শুরুতেই ডিভিশন প্রাপ্ত হিসাবে মর্যাদা দিতে হবে। জেল কোড অনুসারে বিভিন্ন শর্ত আরোপ করে নির্দিষ্ট অন্তর বন্দীদেরকে তাদের স্ত্রী ও পরিবারের সঙ্গে কারাগারের মধ্যে নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ দিয়ে (কমপক্ষে ৫ ঘণ্টা) নিরিবিলি থাকার সুযোগ দিতে হবে। তাতে বন্দীদের জৈবিক ও মানবিক চাহিদা পূরণ হবে। তাতে সংসারে শান্তি বজায় থাকবে।

পরিশেষে বলব, আদালতে ইসলামী বিধান ও দণ্ডবিধিসমূহ কার্যকর করা এবং কারাগারে মানবিক আচরণ নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন- আমীন!

৭. দৈনিক ইনকিলাব (অনলাইন সংস্করণ), ২৫ জানুয়ারি ২০২১।

হারামাইনের মিম্বার থেকে-এর বাকী অংশ

(কেননা তাদের এ পদচারণা) সামান্য কয়দিনের উপভোগ মাত্র। এরপর তাদের থাকার জায়গা হবে জাহান্নাম। আর তা কতই না নিকৃষ্ট আবাস। তবে যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে ঝরনাধারা প্রবাহিত হচ্ছে। তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। এটা হবে তাদের রবের পক্ষ থেকে মেহমানদারী। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা হবে নেককার লোকদের জন্য অতীব উত্তম। নিশ্চয়ই আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং তোমাদের কাছে পাঠানো কিতাবের উপর ঈমান আনে এবং তাদের কাছে পাঠানো কিতাবের উপরও ঈমান আনে। তারা আল্লাহর অনুগত থাকে। তারা আল্লাহর আয়াতকে অল্প মূল্যে বিক্রি করে না। এদের জন্য আল্লাহর কাছে পুরস্কার রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাবগ্রহণকারী। হে ইমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং এ কাজে সুদৃঢ় থাকো, শত্রুর মোকাবিলায় তৎপর থাকো, আল্লাহকে ভয় করো, অবশ্যই তোমরা সফলকাম হবে'।

আল্লাহর বান্দাগণ! জ্ঞানীদের এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের ধারণ করতে হবে। হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম এবং মুসলিমদের সম্মানিত করুন। মুশকিদের লাঞ্ছিত করুন। আপনার ও আপনার দ্বীন ইসলামের শত্রুদের ধ্বংস করুন। হে আমাদের রব! আপনি আমাদের পাকড়াও করবেন না, যদি আমরা ভুলে যাই অথবা ভুল করি। প্রতিপালক! আমাদের হেদায়াত দেওয়ার পর আমাদের হৃদয়গুলো বক্র করে দিয়েন না। আল্লাহ! আমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিন এবং কার্যক্ষেত্রে আমাদের সীমালঙ্গন ক্ষমা করে দিন। লড়াইয়ের ময়দানে আমাদের দৃঢ়পদ রাখুন, কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন।

www.al-itisam.com

আমাদের রোল মডেল কে?

-জাবির হোসেন*

শনিবারের দিন, বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যাবেলায় শাকিলদের ঘরের আড্ডাটা জমে উঠেছে। কাল রবিবার, কলেজ বন্ধ। তাই, পড়াশোনার চাপ কম। এরকম আড্ডা হোস্টেল-মেসে নিত্যদিনই হয়। বিনোদন, খেলা, রাজনীতিসহ আরও অন্যান্য বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক অনেক সময় নিয়ন্ত্রণে আনা মুশকিল হয়ে পড়ে।

আজকের তর্ক সিনেমা নিয়ে। শাকিলদের এই ঘরে মোট চারজন থাকে। চারজনই জন্মগত মুসলিম। তর্কের বিষয়- 'কে বড় অভিনেতা? শাহরুখ খান নাকি সালমান খান?' এই নিয়ে তারা দুটি দলে বিভক্ত হয়েছে। শাকিল ও সিরাজ এস.আর.কে ভক্ত; অপরদিকে হাবিব ও নবাব সাল্লু'র একনিষ্ঠ ফ্যান।

তর্কের এই ময়দানে কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলছে না। শাহরুখ ভক্তবৃন্দের দাবি, 'শাহরুখ খান হলো বলিউডের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। সে হলো বলিউডের বাদশা। কিং খান নামেও সে পরিচিত'।

কোন ফিল্ম বক্স অফিসে কত টাকা ইনকাম করেছে, IMDb-তে শাহরুখের ছবির রেটিং কত, সে ক'টি ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে, তার ক'টি ছবি অস্কারের জন্য নোমিনেটেড হয়েছিল- এই সব পরিসংখ্যান তুলে ধরছে।

অপরপক্ষের ভক্তবৃন্দও কিন্তু কোনো অংশে কম যায় না। তারা সালমানের বক্স অফিস হিট করা ছবি তুলে ধরে প্রতিপক্ষকে মাথানত করাতে সিদ্ধহস্ত।

এমন সময় আমি ও আহমাদ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম। আহমাদ সকলকে উদ্দেশ্য করে সালাম দিল, 'আস-সালামু আলাইকুম!'

তাদের মধ্যে গুনগুন করে কেউ উত্তর দিল, আবার কেউবা দিল না। আমাকে দেখে দলে টানার জন্য সিরাজ বলল, 'ভাই বলতো, বলিউডের কোন অভিনেতা শাহরুখ খানের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারবে? ওরা আবার সালমান খানের গল্প শোনাচ্ছে। শাহরুখের ধারেকাছে কি ঘেঁষতে পারবে সালমান?'

অপরদিকে সাল্লু ভক্ত নবাব বলে উঠল, 'তবে রে! সালমানের বডির ধারে কাছে যেতে পারবে না শাহরুখ। সালমানের মাসেল দেখেছিস। মাসেলের কথা এলে সর্বাগ্রে নাম আসবে সাল্লু ভাইয়ের'।

শাকিল বলে উঠল, 'তোরা ওই মাসেল নিয়েই পড়ে থাক। অভিনয় করতে ট্যালেন্ট লাগে রে- ট্যালেন্ট। শাহরুখ খানের তা আছে। নামি প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি হাছিল করেছে। নিজে জিরো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে উঠে এসেছে। বংশ পরম্পরায় বাপের নাম ভাঙিয়ে নয়'।

আমি কিছু বলতে যাবো- এমন সময়, আহমাদ আমাকে থামিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বলতে শুরু করল, 'তোরা শাহরুখ আর সালমানকে নিয়ে মেতে আছিস। 'কে বড় অভিনেতা' তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক করছিস। তোরা তাদের অন্ধ ভক্ত। এমন ভক্ত যে, তোদের কাউকেই তারা চিনে না। সারাদিন তর্ক-বিতর্ক করে নিজেদের মডেলকে যতই জেতাতে চাস না কেন, সেটা তোদের তুষে পাহাড় দেওয়া বৈ কিছুই হবে না।

একটু সময় বের করে যদি নিজেদের দ্বীন-ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতিস, পরকাল নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করতিস, তাহলে অনেক লাভবান হতে পারতিস। কম সে কম জাহান্নামের আগুন থেকে তো বাঁচতে পারতিস'।

আহমাদের কথা শুনে নবাব বলে উঠল, 'ওই দেখ, মোল্লা সাহেব ধর্মের কাহিনী শোনাতে এসেছে। -তা বাবা! নিজেদের দ্বীন-ধর্ম নিয়ে কী ভাববো শুনি? দ্বীন-ধর্ম কি আমায় খেতে দেবে?'

আহমাদ বলল, 'কী ভাববি তাই তো? তবে, তোদের প্রথমে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তোরা সবাই মুসলিম তো?'

শাকিল, হাবিব, সিরাজ ও নবাব সমস্বরে বলে উঠল, 'আরে বলিস কী? আমরা মুসলিম না হলে আব্বা এমনি এমনি আমাদের মুসলমানী দিয়েছে। এতে আবার তোর সন্দেহ আছে! অবশ্যই আমরা মুসলিম'।

আহমাদ বলল, 'তবে, আরও একটা প্রশ্ন করি। তোরা কুরআনে বিশ্বাস করিস তো?'

'অফ কোর্স! হোয়াই নট, আফটার অল কুরআন আমাদের ধর্মগ্রন্থ' শাকিল বলল।

শাকিলের কথায় অপর তিনজনে মাথা হেলিয়ে সমর্থন দিল।

আহমাদ বলল, 'তবে যে তোরা এস.আর.কে ভক্ত বা সালমান ভক্ত দাবি করছিস, তা কুরআনের দৃষ্টিতে কার ফ্যান হওয়া উচিত?'

* এম. এ. (অধ্যয়নরত), বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

নবাব বলল, 'আমরা তো জাস্ট এন্টারটেইনমেন্টের জন্য এগুলো করি। এগুলোর সঙ্গে ধর্মের আবার কী সম্পর্ক!'

'শুধুই কি এন্টারটেইনমেন্ট? নাকি অন্য কিছু' আহমাদ বলল।

শাকিল বলল, 'তবে?'

আহমাদ বলল, 'মানুষ যে যাকে সত্যিকারার্থে ভালোবাসে, সে তার অনুসরণ-অনুকরণ করে থাকে, এটা তো জানিস।

এই দেখ, তুই শাহরুখের ভক্ত, তাই তোর চুলের স্টাইল তার মতো। আবার হাত ঘড়ি, চশমা সবকিছু তার আদলে করার চেষ্টা করছিস। আবার দেখ, যে মেসির ভক্ত, সে তার অনুকরণে ১০ নম্বর জার্সি পরে। আবার কিছু মহিলাদের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, তারা সেসব পোশাক ক্রয় করছে, যেগুলো কোনো মডেল বা অভিনেত্রী পরিধান করে ফিল্ম অথবা সিরিয়ালে অভিনয় করেছে। এখন, মার্কেটে এই সব পোশাক দেদারসে বিক্রি হচ্ছে।

আচ্ছা! বলতো এটা কেন?'

নবাব বলল, 'এটা আমাদের ও তাদেরকে ভালো লাগে তাই'।

'এক্জ্যাক্টলি তাই! তবে, একজন মুসলিমের এই ভালোলাগাটা লাগামহীন নয়। এটা জানিস কি?' আহমাদ বলল।

সিরাজ বলল, 'তা কেমন?'

আহমাদ বলল, 'একজন মুসলিমকে অবশ্যই আল্লাহর প্রতি, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ও কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। একেবারে দৃঢ় বিশ্বাস। যখন কেউ আল্লাহ, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, তখন তার কাছে রোল মডেল হিসাবে শাহরুখ খান, সালমান খান, আমির খান, রোনাল্ডো, মেসি, শচীন, সৌরভ, বিদ্যাসাগর বা রবীন্দ্রনাথ, কার্ল মার্কস, লেলিন, এঞ্জেলো প্রমুখ কেউই উঠে আসবে না।

মুসলিমের রোল মডেল বা আদর্শ কে হবে, তা নির্বাচন করার অধিকার একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত অন্য কারুর নেই। সৃষ্টিকর্তা সঠিকভাবে অবগত কাকে অনুকরণ বা অনুসরণ করে চললে তার ব্যক্তি জীবন এবং সমাজ-সোসাইটিতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সেই মানুষটি কে? দুনিয়ার কোনো দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, সমাজবিদ, অভিনেতা, সাহিত্যিক বা অন্য কিছু? রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শাহরুখ খান, সালমান খান, মেসি, রোনাল্ডো? তবে কে?'

হাবিব বলল, 'তবে কে? কে আমাদের রোল মডেল?'

আহমাদ বলল, 'কুরআনে বিশ্বাসী বন্ধু আমার! একবার তো কুরআন পড়ে দেখ। কুরআন কী বলছে!

'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ' *(আল-আহযাব, ৩৩/২১)*। এই আয়াত থেকে পরিষ্কার যে, সৃষ্টিকর্তা আমাদের জন্য মডেল বা আদর্শ হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন আমাদের শেষ নবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে।

এখন কেউ যখন কাউকে রোল মডেল হিসাবে গ্রহণ করে, তখন তার অন্ধানুকরণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। সেই সেলিব্রেটির ছাপ নিজেদের পার্সোনাল লাইফে অঙ্কিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে কোনরূপ ত্রুটি করে না। তারা যে স্টাইলে চুল-দাড়ি কাটাবে, এরাও তার অন্ধ অনুসরণ করবে। তারা যে ফ্যাশনের পোশাক পরিধান করবে, সেই একই ফ্যাশন ক্রয় করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে। তাদের কথা-বার্তা, চাল-চলন, পোশাক-আশাক হুবহু তাদেরই মতো করার চেষ্টা করবে।

তবে তোরা বলতো, এটা কি আমাদের অর্থাৎ মুসলিমদের জন্য কখনো করা উচিত?'

আমি বললাম, 'অবশ্যই না। এটা কুরআনের পরিপন্থী'।

আহমাদ বলল, 'একদম ঠিক। আমরা মুসলিমরা এমন এক জাতি, যাদের একটি নিজস্ব আদর্শ আছে। নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। নিজস্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে। তবে, কেন আমরা বিজাতিদের আদর্শ গ্রহণ করব?

আমরা কি নদীতে ভাসা খড়কুটোর মতো ভ্যালুলেস? আমরা কি আত্মবিশ্বাসহীন? আমরা কি হীনমন্য? না। আমরা নদীতে ভাসা খড়কুটোর মতো ভ্যালুলেস নই; আমরা আত্মবিশ্বাসহীন নই; আমরা হীনমন্য নই। আমরা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে পোশাক-আশাক, মন-মানসিকতা চেইঞ্জ করব- এইরকম জাতি নই।

আমরা সেই জাতি, যে জাতির ইতিহাসে ছত্রে ছত্রে লুকিয়ে আছে শিক্ষণীয় ঘটনা। আছে মানবিকতা, সহমর্মিতা, সৌভ্রাতৃত্ব, অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ, সদাচরণ প্রভৃতির শিক্ষা'।

একটু থেমে আহমাদ পুনরায় বলতে শুরু করল, 'আমাদের লিডার মাত্র ২৩ বছরের আন্দোলনে এক অন্ধকারে নিমজ্জিত অসভ্য, বর্বর জাতিকে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্বের জায়গা করে দিয়েছিলেন; তারই উত্তরসূরীরা অল্প সময়ের ব্যবধানে অর্ধেক পৃথিবী জয় করে নিয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আসনগুলো দখল করেছিল। এই লিডার সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা' বলতে বাধ্য হয়েছে, 'Muhammad was the

www.al-itisam.com

most successful of all religious personalities'. অর্থাৎ 'মুহাম্মাদই হলেন সবচেয়ে সফলকাম ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব'।[১]

আমাদের সৃষ্টিকর্তা এই রোল মডেলকে ভালোবাসতে এবং তাঁরই অনুসরণ ও অনুকরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 'বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো। আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেবেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল দয়ালু' *(আলে ইমরান, ৩/৩১)*।

আমাদেরকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইত্তিবা করতে হবে। ইত্তিবা-এর শাব্দিক অর্থ পদাঙ্ক অনুসরণ করা। মনে করো বৃষ্টিভেজা অন্ধকার রাতে কোনো কর্দমাক্ত জমির মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি। সামনের জনের হাতে হারিকেন আছে। পিছনের সবাই তার অনুসরণ করছে। এখানে অনুসরণ মানে কী? ২য় জন ঠিক ওই জায়গায় পা ফেলছে, যেখানে প্রথমজন পা ফেলেছে। একটু এদিক-সেদিক হলে আশঙ্কা আছে পিছলে পড়ার। ভয় আছে কোনো বিষাক্ত পোকা-মাকড়ের উপর পা পড়ে যাওয়ার। কিন্তু যে সামনে আছে, তার হাতে হারিকেন থাকায় সে সবকিছু দেখতে পাচ্ছে। আমরা অন্ধের মতো শুধু তার পা ফেলা জায়গায় পা ফেলছি। এর নাম পদাঙ্ক অনুসরণ। একে বলে ইত্তিবা। ঠিক এই কাজটিই আমাদেরকে করতে বলেছেন মহান আল্লাহ। যতক্ষণ না আমরা হুবহু রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ করব, ততক্ষণ ইত্তিবার অর্থ বাস্তবায়ন হবে না।[২]

কিন্তু আমরা এমন কাউকে ভালোবাসছি, যে নিজেই জানে না তাকে আমরা ভালোবাসি বা তাঁর ফ্যান। এ কেমন ভালোবাসা? এ কেমন ভক্ত?

অথচ রাসূল ﷺ-কে ভালোবাসলে আমরা দুনিয়াতেও উপকৃত হব; পাশাপাশি পরকালেও। হায় আফসোস! মুসলিম সমাজ যদি রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করত, তাহলে পুরো সমাজ বদলে যেত। আজকে অমুসলিমরা আমাদের আদর্শ, আচার-ব্যবহার দেখে ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। একদিন যারা উন্নত চরিত্র, আদর্শ, ব্যবহার দেখে দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। কোথায় সেই ত্যাগ? কোথায় সেই শিক্ষা। বর্তমানে আমাদের মধ্যে নেই দয়া, মায়া, ক্ষমা, রাগ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি মানবীয় গুণ। আছে শুধু হিংসা, বিদ্বেষ ও অহংকার আর আছে পরশ্রীকাতরতা ও প্রাচুর্যতা অর্জনের প্রতিযোগিতা।

আহমাদ সকলের দিকে তাকিয়ে পুনরায় বলতে শুরু করল, 'ভাই সকল! নিজেদের হিরোকে জানার চেষ্টা করো, যদি সফল হতে চাও। তর্ক পরিহার করো, যদি পরকালে আফসোস না করতে চাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শে আদর্শিত হও, নইলে একদিন পস্তাতে হবে'।

'রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যদি আমরা না মেনে চলি, তাহলে আমাদের কী শাস্তি হবে জানিস?' আহমাদ বলল।

আমি বললাম, 'তুই বল?'

আহমাদ বলতে লাগল, যদি আমরা আমাদের রাসূল ﷺ-কে ভালোবাসতে না পারি, যদি আমরা আমাদের রাসূল ﷺ-এর যথাযথ অনুসরণ না করি, তবে পরকালীন জীবনে আমাদের জন্য চরম যন্ত্রণাদায়ক ও অপমানজনক শাস্তি অপেক্ষা করছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا 'আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করবে, অবশ্যই তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, তাতে তারা চিরকাল থাকবে' *(আল-জিন, ৭২/২৩)*।

'আর সেদিন অপরাধী নিজের দু'হাত কামড়িয়ে বলবে, হায় আফসোস! যদি আমি রাসূল ﷺ-এর পথ অনুসরণ করতাম। হায়! আমার দুর্ভোগ! আমার আফসোস! যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। অবশ্যই সে আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশবাণী কুরআন পৌঁছার পর; আর শয়তান হলো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক' *(আল-ফুরক্বান, ২৫/২৭-৩০)*।

লম্বা বক্তব্য পেশ করে আহমাদ থামল। আমরা সবাই একে অপরের দিকে তাকাচ্ছি। সবাই চুপ, পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে ঘরে। কেউ কিছু বলছে না। আমার মনে হলো, হয়তো বা সবাই আহমাদের কথাগুলো মনে মনে ভাবছে। সালাম জানিয়ে আহমাদ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমিও পিছু পিছু বের হলাম।

১. আহমেদ দীদাত, মহাত্তম মানব হজরত মুহাম্মদ (সাঃ), (প্রকাশনী : কলকাতা, জানুয়ারি-২০১০), পৃ. ২৪।

২. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক, আমরা হাদীছ মানতে বাধ্য (নিবরাস প্রকাশনী, ডিসেম্বর-২০১৬), পৃ. ১১৮।

রাবী পরিচিতি-৫ : আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক্ব আল-ওয়াসিত্বী আল-কূফী রাহিমাহুল্লাহ

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

ভূমিকা : রাবী সম্পর্কে আমাদের ধারাবাহিক আলোচনার এই পর্যায়ে আমরা আজকে একজন রাবী সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশা-আল্লাহ। তিনি হলেন আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক্ব আল-ওয়াসিত্বী রাহিমাহুল্লাহ।

পরিচিতি : তার নাম হলো, عَبد الرَّحمَن بْن إسحاق بْن الحارث أَبو شَيبة الواسِطِيّ ‘আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক্ব ইবনু হারেস, আবূ শায়বাহ আল-ওয়াসিত্বী’।[১] তার উপনাম হলো আবূ শায়বাহ।[২] তিনি ওয়াসিত্বে জন্মগ্রহণ করেছেন বিধায় তাকে ওয়াসিত্বী বলা হয়।[৩] জীবনের কিছুকাল তিনি কূফাতেও কাটিয়েছিলেন। তার জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে তেমন কিছু পাওয়া যায় না।

ইমামদের অভিমতসমূহ : তার সম্পর্কে ইমামদের মত নিম্নরূপ-

(১) ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৩ হি.) বলেছেন, ضعيف ليس بشيء ‘তিনি যঈফ; তার হাদীছের সংখ্যা খুবই কম’।[৪]

(২) আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেন, منكر الحديث ‘তিনি মুনকারুল হাদীছ’।[৫]

(৩) বুখারী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.) বলেছেন, ضعيف الحديث ‘তিনি যঈফুল হাদীছ’।[৬]

(৪) ইবনু আদী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, فيه نظر ‘তার মধ্যে সমস্যা আছে। সমর্থক হাদীছের মাধ্যমে তার তাকে শক্তিশালী করা যাবে না।[৭]

(৫) নাসাঈ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩০৩ হি.) বলেছেন, ضعيف ‘তিনি যঈফ’।[৮]

(৬) ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেছেন, كوفيٌّ ضعيف ‘তিনি কূফার অধিবাসী, যঈফ’।[৯]

তার বর্ণিত কয়েকটি যঈফ হাদীছ : তিনি রাবী হিসাবে প্রসিদ্ধ। তার দুটি যঈফ বর্ণনা নিম্নরূপ-

বর্ণনা-১ :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا ﷺ قَالَ : السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘ছালাতের মধ্যে নাভির নিচে (বাম) কব্জির উপর (ডান) কব্জি স্থাপন করা সুন্নত’।[১০]

বর্ণনা-২ :

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الأَسْوَدِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهَا أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « قُولِي اللَّهُمَّ هَذَا اسْتِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ وَحُضُورُ صَلَوَاتِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ».

উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই দু‘আটি শিখিয়ে দিয়ে বলেছেন, তুমি বলো : ‘হে আল্লাহ! এখন তোমার রাতের আগমনের সময়, তোমার দিন চলে যাওয়ার সময়, তোমার দিকে আহ্বানকারীর (মুআযযিনের) আওয়ায দেওয়ার সময় এবং তোমার ছালাতে হাযির হওয়ার সময়। আমি তোমার কাছে দু‘আ করি, তুমি আমাকে মাফ করে দাও’।[১১]

উপসংহার : এই পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হলো যে, ‘আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক্ব’ জমহূর মুহাদ্দিছীনে কেরামের নিকটে যঈফ ও সমালোচিত। কতিপয় মুহাদ্দিছ তাকে মিথ্যার দোষে অভিযুক্ত এবং পরিত্যাজ্যও বলেছেন। সুতরাং তার রেওয়ায়াত প্রত্যাখ্যাত।

উল্লেখ্য যে, বর্ণনাদ্বয়ে আরও কিছু ত্রুটি রয়েছে। তবে এখানে আব্দুর রহমান আলোচ্য বিষয়বস্তু হওয়ার কারণে সেগুলো উল্লেখ করা হলো না।

---

১. ইমাম বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর, রাবী নং ৮৩৫।
২. প্রাগুক্ত।
৩. প্রাগুক্ত।
৪. আল-জারহু ওয়াত-তা‘দীল, ৫/২১৩, সনদ ছহীহ; তারীখে ইবনে মাঈন, জীবনী নং ১৫৫৯, ৩০৭০।
৫. ইমাম বুখারী, কিতাবুয যু‘আফা, জীবনী নং ২০৩; আত-তারীখুল কাবীর, ৫/২৫৯।
৬. ইমাম তিরমিযী, আল-ই‘লাল, ১/২২৭।
৭. ইমাম ইবনু আদী, আল-কামিল, ৪/১৬১৩, সনদ ছহীহ।
৮. ইমাম নাসাঈ, কিতাবুয যু‘আফা, জীবনী নং ৩৫৮।
৯. তাক্বরীবুত তাহযীব, জীবনী নং ৩৭৯৯।
১০. আবূ দাঊদ, হা/৭৫৬; যঈফ আবূ দাঊদ, হা/১৫৭।
১১. তিরমিযী, হা/৩৫৮৯; যঈফ তিরমিযী, হা/১০।

আসমান-যমীন কত দিনে সৃষ্টি এবং কোনটি আগে সৃষ্টি হয়েছে?

-আব্দুর রাযযাক বিন মাসির*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

'নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক সেই আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি স্বীয় আরশের উপর উঠেছেন। তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এমনভাবে যে, রাত্রি ও দিবস একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে তড়িৎ গতিতে। সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি সবই তাঁর হুকুমের অনুগত। জেনে রেখো! সৃষ্টির একমাত্র কর্তা আর হুকুমের একমাত্র মালিক তিনিই, সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ বরকতময়' *(আল-আ'রাফ, ৭/৫৪)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ

'তিনি আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এতদুভয়ের অন্তবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশের উপর উঠেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক এবং সুপারিশকারী নেই' *(আস-সাজদা, ৩২/৪)*। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

'আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী। আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি; আর আমি কত সুন্দরভাবেই না এটি বিছিয়েছি। আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো' *(আয-যারিয়াত, ৫১/৪৭-৪৯)*।

উল্লেখিত আয়াতগুলো থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ ছয় দিনে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর এই সবকিছু সৃষ্টি করার পর তিনি আরশের উপন উঠেছেন। আর শেষের আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনি নিজ ক্ষমতা বলে আকাশ সৃষ্টি করে তা সম্প্রসারণ করেছেন। আর তিনি সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। এখানে জোড়ায় জোড়ায় বলতে বোঝানো হয়েছে, আসমান-যমীন, রাত-দিন, জীবন-মৃত্যু, জল-স্থল, জান্নাত-জাহান্নাম, ঈমান-কুফর ইত্যাদি।

কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি হয়। এখন কথা হলো, এখানে ছয় দিন বলতে কী বুঝানো হয়েছে? সেই দিনগুলো এই দিনের মতো ছিল নাকি ১ হাজার বছর বিশিষ্ট দিন ছিল? এবিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। তবে এখানে 'দিন' বলতে 'সময়সীমা' বোঝানো হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এখানে 'দিন' বলতে এক দিনের সূর্যোদয় থেকে পরের দিনের সূর্যাস্ত পর্যন্ত বোঝানো হয়নি। কারণ তখনো সূর্য সৃষ্টি করা হয়নি। যার কারণে এটা বলা যাবে না।

এখন কথা হলো যে, পৃথিবী আগে সৃষ্টি হয়েছে নাকি আকাশ আগে সৃষ্টি হয়েছে? দু'টি সূরায় পৃথিবী সৃষ্টির কথা আগে এসেছে। সূরা আল-বাক্বারা, ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

'তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আকাশের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন, এরপর তিনি আকাশকে সাতটি স্তরে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী'। আর সূরা ত্বো-হার ৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'যিনি যমীন ও সুউচ্চ আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন'। আর যেই সকল আয়াতে আকাশমণ্ডলী সৃষ্টির কথা আছে, সেই আয়াতগুলোর সংখ্যা হলো ৯টি। সূরা আল-আ'রাফের ৫৪ নং আয়াত, সূরা ইউনুসের ৩ নং আয়াত, সূরা আস-সিজদার ২৪ নং আয়াত, সূরা ফাতিরের ৩৮ নং আয়াত, সূরা হাদীদের ৪ নং আয়াত, সূরা নাজিয়াতের ২৭-৩৩ নং আয়াত ও সূরা শামসের ৫-১০ নং আয়াতে। এই আয়াতগুলোতে আকাশের কথা আগে আছে।

এর সঠিক মত তাফসীর ইবনে কাছীরে রয়েছে, যা সূরা বাক্বারার ২৯ নং আয়াতের তাফসীরে এসেছে। সূরা ফুছছিলাতের ৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

* ছাত্র, ৮ম শ্রেণি, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী।

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ - وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ - ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

‘বলুন, তোমরা কি সে সত্তাকে অস্বীকার করবে, যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক। তিনি ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং তাতে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং চার দিনের মধ্যে তাতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন, সমভাবে পূর্ণ হলো জিজ্ঞাসুদের জন্য। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন, যা ছিল ধুম্রপুঞ্জ বিশেষ। অতঃপর তিনি তাকে এবং পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা উভয়ে বলল, আমরা স্বেচ্ছায় অনুগত হয়ে আসলাম। অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশকে তাঁর আদেশ প্রেরণ করলেন। আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত ও সুসংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা’।

উক্ত আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, মহান আল্লাহ প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করছেন। তারপর সাতটি আকাশ নির্মাণ করেছেন। আমরা সকলেই জানি, একটা বিল্ডিং বানানো হলে প্রথমে নিচের অংশ বানাতে হবে। এরপর উপরের অংশ। মুফাসসিরগণের তাফসীর অনুযায়ী, এ জাতীয় আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে এ সংক্রান্ত সকল আয়াত আনুধাবন করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا - رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا - وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا - وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا - أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا - وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا - مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ

‘তোমাদের সৃষ্টি করা কঠিনতর নাকি আকাশ সৃষ্টি? তিনিই এটা নির্মাণ করেছেন, তিনি একে সুইচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন, তিনিই এর রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন ও এর সূর্যালোক প্রকাশ করেছেন এবং এরপর পৃথিবীকে করেছেন বিস্তৃত, তিনি এর মধ্য থেকে বের করেছেন পানি ও তৃণ, আর পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন। এর সবকিছু তোমাদের ও তোমাদের জন্তুর ভোগের জন্য’ *(আন-নাযিয়াত, ৭৯/২৭-৩৩)*।

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ আকাশের পর যমীন সৃষ্টি করেছেন। কারো কারো মতে, পরবর্তী আয়াতে আসমান সৃষ্টির পরে যমীন বিস্তৃত করা, সেখান থেকে পানি বের করা ইত্যাদির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে এটা বলা হয়নি যে, আকাশ সৃষ্টি করার পর যমীনকে সৃষ্টি করেছেন। তাই এটাই ঠিক যে, প্রথমে যমীন সৃষ্টি হয়েছে, তারপর আকাশ সৃষ্টি হয়েছে। তারপর যমীনকে সুসজ্জিত করা হয়েছে।

তাছাড়া আয়াতের মধ্যে লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, সেখানে ثم বলা হয়েছে। আর ثم ব্যবহার হয় তখন, যখন কোনো কাজ শেষ করে অন্য কোনো কাজ শুরু করা হয়। আর এখানেও ঠিক একইভাবে বুঝানো হয়েছে যে, তিনি পৃথিবীতে তোমাদের যা কিছু প্রয়োজন, তার সবকিছু সৃষ্টি করার পর আকাশে মনোযোগ দিয়েছেন।

তাছাড়া ছহীহ বুখারীতে এসেছে যে, ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি উত্তরে বলেন যে, যমীন তো আকাশসমূহের পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যমীনকে বিছানো হয়েছে পরে।[১] ওলামায়ে কেরাম সকলের উত্তর এটাই; অতীতের এবং বর্তমানে অনেক তাফসীরকারক একই কথা বলেছেন।

উক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, যমীন সৃষ্টি হয়েছে আকাশের আগে।

১. ফাতহুল বারী, ৮/৪১৭।

মাসিক ‘আল-ইতিছাম’-এর নির্ধারিত বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ- ৫০০০ টাকা
৩য় প্রচ্ছদ- ৪০০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা- ২০০০ টাকা
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা- ১০০০ টাকা

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
০১৪০৭-০২১৮৩৯

www.al-itisam.com

আজব দেশের আজব রাজা

-নাহরিন বানু এশা*

অনেক দিন আগের কথা। পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা এক অপূর্ব সুন্দর রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের রাজা বানানোর পদ্ধতি ছিল অসাধারণ ও আশ্চর্যজনক। সে দেশের গণ্য-মান্য ও অভিজাত শ্রেণি নিয়ে একটি মন্ত্রিপরিষদ ছিল। তারা বছরের প্রথম দিন, তাদের রাজা পরিবর্তন করত। তারা বছরের শেষের দিন যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে ভেতরে আসত, তাকে রাজা বানিয়ে নিত। আর যে এক বছর তাদের রাজা ছিল, তাকে তারা গভীর জঙ্গলের এমন এক ভয়ংকর জায়গায় ছেড়ে আসত, যেখানে বিষধর সাপ ও বিচ্ছুতে পরিপূর্ণ থাকত। আশে-পাশের ভয়ংকর গুহাগুলোতে নরকঙ্কাল পড়ে থাকত। সেই সাথে আশে-পাশের গাছগুলো ছিল খুব বিষাক্ত। তদুপরি নরখাদক জীবজন্তুর আবাস ছিল সেখানে। অতএব বিপদ থেকে যদি কোনো রাজা বেঁচেও যেত, কিন্তু ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে এক সময় ধুঁকে ধুঁকে তাকে মরতেই হতো। এভাবেই বছরের পর বছর নতুন কোনো পথিক এক বছরের জন্য রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্বপূর্ণ রাজা নির্বাচিত হতো এবং বছর শেষে তাকে এই ভয়ংকর পরিণতি বরণ করতে হতো। এভাবেই অনেক রাজা সারা বছর আরাম-আয়েশ ভোগ-বিলাস, মদ-নর্তকী, গান-বাজনা ইত্যাদি জাঁকজমকতায় মেতে থাকত। বছর শেষে তাকে গহীন অরণ্যের সেই ভয়ংকর মৃত্যুপুরীতে ছেড়ে আসা হতো।

একবার এক জ্ঞানী যুবক দেশ ভ্রমণে বের হলো। বিভিন্ন দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি তার ছিল গভীর আগ্রহ। এভাবে ঘোরাঘুরির সাথে সাথে দিন মজুরি করে নিজের দু'বেলার খাবারও যোগাড় করে ফেলত। জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের দরবারেও তার ছিল অবাধ যাওয়া-আসা। এভাবেই একদিন ঘুরতে ঘুরতে সে সেই আজব দেশের সীমানায় এসে পৌঁছল, ঠিক বছরের শেষের দিনেই। দূর থেকে সে লক্ষ্য করল, অপূর্ব সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে অগণিত মানুষ ঢাক-ঢোল বাজিয়ে নেচে-গেয়ে কাউকে যেন স্বাগত জানাচ্ছে। গভীর আগ্রহে কাছাকাছি পৌঁছতেই দেখা গেল, সবাই তাকে নিয়েই মাতামাতি শুরু করেছে। তাকে পেয়ে সবার খুশির মহোৎসব শুরু হলো। তাকে ফুলের মালা পরিয়ে, পায়ের নিচে গালিচা বিছিয়ে সবাই স্বাগত জানাতে লাগল।

সে অবাক হয়ে তাদের জিজ্ঞেস করল, কেন এভাবে তাকে স্বাগত জানানো হচ্ছে? তাকে বলা হলো, আপনাকে এই রাজ্যের রাজা নির্বাচন করা হয়েছে। তাকে অনেক ইযযত ও সম্মানের সাথে রাজমহলে নিয়ে যাওয়া হলো। যুবক একেবারেই হতভম্ব, সেই সাথে অনেক খুশি। সেই এই বিশাল রাজ্যের রাজা। সিংহাসনে বসানোর পর তাকে রাজমুকুট পরানো হলো। সামনে সুবিশাল আসনে সভাসদরা বসে একে একে তাকে রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বোঝাতে লাগল। অপূর্ব এক আনন্দ ও আভিজাত্যে তার অন্তর পুলকিত হতে লাগল। প্রাসাদের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য ও সৈন্য-সামান্তের বহর দেখে তার হৃদয় আনন্দে ভরে উঠল। সুন্দরী রাণী ও বাঁদীদের আনাগোনায় নিজেকে সবচাইতে সুখী ব্যক্তি বলে তার মনে হলো। এভাবেই বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হলো।

একদিন দরবার চলাকালে সে তার সভাসদদের জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা আমার পূর্বে যে রাজা ছিল, সে এখন কোথায়? প্রশ্ন শুনে সবাই চোখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল! কে বলবে এত বড় ঘটনার কথা। তাদের অঙ্গভঙ্গি দেখে যুবক রাজা তার প্রশ্নে অনড় থাকল। শেষে দরবারের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও বৃদ্ধ উযীর তাদের দেশের রাজা নির্বাচনের প্রথা ও তার পরিণতি সম্পর্কে তাকে বুঝিয়ে বলল যে, এই দেশে প্রতিবছর নতুন রাজাকে আপনার মতো সিংহাসনে বসানো হয় এবং বছর শেষে তাকে এক ভয়ংকর জঙ্গলে ছেড়ে আসে তার প্রতিরক্ষা বাহিনী।

এসব কথা শুনে সে ভেতর ভেতর চমকে উঠলেও মুখে কিছু বলল না। সে বুঝল যে, সে এক চমৎকার সাজানো গোছানো ফাঁদে পড়ে গেছে, যেখান থেকে বেরুবার কোনো রাস্তা নেই। সে সারারাত তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক চিন্তা-ভাবনা করল। পরের দিন দরবারে ঘোষণা দিল, সে সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে আশে-পাশের সবচেয়ে ভয়ংকর জঙ্গলে শিকারে যাবে। ফলে সভাসদরাও শিকারে যাওয়ার আনন্দে মেতে উঠল। পরম আনন্দে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে সবাই যাত্রা শুরু করল সেই বিভীষিকাময় জঙ্গলের পথে। রাজা হাতীর পিঠে চড়ে উযীর, নাযীর, মন্ত্রী ও সিপাহীদের নিয়ে মহাসমারোহে বের হলো।

* নামোশংকরবাটি, বাগানপাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

অবশেষে দীর্ঘ সফরের পর সেই জঙ্গলে তারা পৌঁছে গেল। রাজা শিকারের নামে সুকৌশলে পুরো জঙ্গলের অবস্থান ও স্থিতি পর্যবেক্ষণ করল। পুরো সপ্তাহ সে জঙ্গল সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা লাভ করল। পাহাড় ডিঙ্গিয়ে জঙ্গলের আরও গহীনে প্রবেশ করতে চাইলে সবাই ভয় পেয়ে গেল। রাজা বুঝল ওটাই সে স্থান, যেখানে বছর শেষে তাকে ফেলে আসা হবে। যেখানকার ভয়ংকর নরখাদক জন্তু ও বিষাক্ত সাপের গল্প সে সিপাহীদের মুখে আগেই শুনেছে।

যাহোক, আরেকটু ভিতরে প্রবেশের কথা শুনে সবাই রাজ্যে ফিরে যাওয়ার জন্য তোড়জোড় শুরু করতে লাগল। বিচক্ষণ রাজা সবই বুঝতে পারল। রাজ্যে ফিরেই সবাই তাদের শিকারের আনন্দদায়ক গল্পে রাজা মাতাতে লাগল। ফাঁক বুঝে বিচক্ষণ রাজা প্রস্তাব পেশ করল, রাজ্য থেকে ঐ জঙ্গল পর্যন্ত একটি প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করা হোক, রাস্তার দু'পাশে ফলের গাছ লাগানো হোক, সেই সাথে সেই জঙ্গলের ঠিক মাঝামাঝিতে এক সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করা হোক এবং প্রাসাদের চারপাশে বাগিচা ও নহর প্রস্তুত করা হোক। কী আর করা, রাজার হুকুম বলে কথা! রাস্তা নির্মাণ ও জঙ্গল পরিষ্কার করে প্রাসাদ নির্মাণের কাজ শুরু হলো। সেই সাথে উন্নতিকল্পে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সড়ক, কুয়া, বিভিন্ন সরকারি দফতর তৈরি করা হলো। এতে রাজ্যের প্রজারাও খুব খুশি হলো রাজার উপর। এভাবে রাজা তার শাসনকার্যকে খুব নিষ্ঠার সাথে পালন করতে লাগল।

এভাবেই বছর শেষ হওয়ার আগেই রাস্তা, প্রাসাদ ও বাগিচা সবই তৈরি হলো। এভাবেই ঠিক শেষের দিন রাজা তার দরবারে বলল, দেশের প্রথা অনুযায়ী রাজাকে জঙ্গলে ছেড়ে আসার যে আইন সেটা পুরা করা হোক। তো দরবারীগণ বললেন, আমাদের পরামর্শসভায় এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং এ বছর থেকে আমরা এ বিধান বদলে দিয়েছি। এ প্রথাকে রহিত করা হয়েছে। কেননা আমরা আমাদের সবচাইতে বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ সুযোগ্য রাজা পেয়ে গেছি। ওখানে আমরা সেসব বেয়াকুব রাজাদের ছেড়ে আসতাম, যারা এক বছরের বাদশাহীর মজা লুটত ও আরাম-আয়েশ ও বিলাসে মেতে থাকত এবং বাকি জীবনকে ভুলে যেত। আগের রাজারাও জানত যে, তাদের সেই ভয়ংকর জঙ্গলে ছেড়ে আসা হবে। তারপরও তারা নিজেদের সুরক্ষার জন্য কোনো ব্যবস্থা করত না, ভোগ-বিলাসের আনন্দে তারা তাদের পরিণতির কথা সবই ভুলে যেত। কিন্তু হে মহামান্য রাজা! আপনি আপনার ভয়ংকর পরিণতির কথা সবসময় স্মরণ রেখেছেন এবং প্রজাদের সাথে ন্যায়বিচার করেছেন এবং তাদের সুখ-দুঃখের কথা ভেবেছেন। আমাদের এরকমই বিচক্ষণ রাজার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং আপনি নিশ্চিন্তে আমাদের কর্ণধার হয়ে থাকেন এবং সারাজীবন আমাদের ওপর আপনার সুবিচার প্রতিষ্ঠা করুন।

সুধী পাঠক! এই অসাধারণ রাজ্যের নাম হলো পৃথিবী। আর সেই নতুন রাজা হলো আপনি, আমি, সবাই। আর সেই সফরে বিচ্ছু ও ভয়ংকর প্রাণীতে ভরা জঙ্গল হলো কবর। এবার আপনি সিদ্ধান্ত নিন, কিছু দিন এই পৃথিবীর স্বাদ গ্রহণ করার পর লোকজন এই জায়গাতে আমাদের ছেড়ে আসবে, যেখানে সাপ আর বিচ্ছু থাকবে এবং খাবার ও পান করার কিছুই থাকবে না। সেখানে থাকবে আযাবের ফেরেশতারা। আমরা কি নিজেদের সাথে বিচক্ষণতার পরিচয় দিচ্ছি? কিছু মাস বা কিছু বছর পর লোকজন যখন আমাদেরকে সেখানে রেখে আসবে, সেখানে কি আমরা নিজেদের জন্য মহল তৈরি করতে পেরেছি? আমরা কি সেখানে ফল-ফুলের বাগিচা তৈরি করতে পেরেছি? নাকি ঐসব বেয়াকুব রাজাদের মতো আমরা এই দুনিয়ায় মজা লুটছি? এটা জানার পরও যে, আমাদের যেতেই হবে সেই কবরে।

প্রিয় ভাই-বোনেরা! খুবই অল্প সময়ের এই জীবন আমাদের। এখনো আমরা জীবিত আছি। সুস্থ-সবল আছি। সুতরাং আমাদের এখনো অনেক কিছু করার আছে। শাহী আনন্দে জীবন যাপন করে এই মূল্যবান সময়কে নষ্ট না করি। চিন্তা করে দেখুন! এখনো আমরা অনেক কিছু করতে পারি। কিন্তু এমন সময় আসবে, ছালাত আদায় করার শক্তি থাকবে না। ছিয়াম রাখার শক্তি থাকবে না। কালেমা পড়ার জন্য হয়তো জিহ্বা নাড়ানোর ক্ষমতাটুকুও থাকবে না। অসহায়, অসুস্থ, স্থবির, শক্তিহীন, দুর্বল শরীরে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে থাকব। ফিরে যাওয়ার কোনো পথ থাকবে না। একসময় আমাদের সবচাইতে আপনজনেরা আমাদের পরম আদরে বহন করে রেখে আসবে সেই বিপৎসংকুল দুর্গম জঙ্গলে অর্থাৎ কবরে। মহান আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাই, তিনি যেন আমাকে এবং আপনাদেরকে মৃত্যুর পূর্বে সঠিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করার তাওফীক্ব দান করেন। আমাদের ঈমানকে শক্তিশালী ও মযবূত বানিয়ে দেন। আমাদের আমল দ্বারা আমরা যেন কবরে প্রাসাদ বানিয়ে নিতে পারি। জান্নাতের বাগান বানিয়ে নিতে পারি। হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে সেই তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

www.al-itisam.com

কবিতা

পরশ পাথর

-মো.আবুল কালাম আজাদ
প্রভাষক, আটিপাড়া মুঈনুল উলুম ফাজিল মাদ্রাসা,
আটিপাড়া, উজিরপুর, বরিশাল।

যখনই মানব হারিয়েছে পথ প্রভুর পথটি ছাড়ি,
পঙ্কিলতার তিমিরে ডুবেছে তাগূতের পথ ধরি।
নিজ হাতে গড়া মূর্তি পূজায় মজেছে তারা যবে,
সত্য তখনই চাপা পড়ে গেছে বাতিলের সয়লাবে।
ছেয়ে গেছে যবে ধরণি মোদের ধর্ষণ ব্যভিচারে,
মযলূম যবে কেঁদেছে অঝোরে যুলুম আর অবিচারে।
তখনি রহমান পথহারা সেই মানবের কল্যাণে,
নবী ও রাসূল পাঠালেন ভবে সুপথের আহ্বানে।
মরু আরবের জীর্ণ কুটিরে পূর্ণিমা চাঁদ হয়ে,
নবীজি আমার এলেন ধরাতে শান্তির বাণী লয়ে।
ক্ষিপ্ত হলো নাদান, মূর্খ, বর্বর আরব জাতি,
নিপীড়নে আর যুলুমে তারা তাই তো উঠিল মাতি।
নবীর দেহের রক্ত ঝরাল তায়েফের দুরাচার,
উহুদের মাঠে শত্রুর আঘাতে দাঁত ভেঙে গেল তাঁর।
এত নিপিড়ন, নির্যাতন আর যুলুম সহিয়া সবি,
ইসলামেরই ঝাণ্ডা উড়ায়ে আগায়ে চলিল নবী।
সত্য-ন্যায়ের বিজয় কেতন উড়িল আকাশ পানে,
শান্তি সুখের ফোয়ারা ছুটিল মানুষের প্রাণে প্রাণে।
পৌত্তলিকতার অবসান হলো ধর্ষণ গেল মুছে,
দারিদ্র গেল বিমোচিত হয়ে হাহাকার গেল ঘুচে।
নারী পেল তার যথার্থ মান, ফিরে পেল অধিকার,
উচ্ছেদ হয়ে গেল মদ জুয়া করুণায় আল্লাহর।
হানাহানি আর ভেদাভেদ ভুলে সাম্যের জয়গানে,
জাগিল মানুষ, চলিল আগায়ে নতুন বিশ্বায়নে।
ইসলাম সে তো পরশ পাথর যে জন পেয়েছে তারে,
সোনার মানুষ হয়েছে সে জন এ জগৎ সংসারে।
ইসলাম সে তো আল্লাহর দান মোদের এ ধরণি তলে,
মানব জাতির মুক্তি সনদ ইহকাল ও পরকালে।

মৃত্যু

-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ
মুহিমনগর, চৈতনাখিলা, শেরপুর।

কই পালাবে, কোন সুদূরে?
মৃত্যু কাছে আসবেই,
ভালো আমল করে গেলে
প্রাণ খুলে সে হাসবেই।
মুমিন যিনি মৃত্যু থেকে
ভয় করে না মোটেই,
আদেশ নিষেধ প্রভুর বাণী
ভালো কর্মের চোটেই।
মৃত্যু হলো অনুগ্রহ
ভালো লোকের জন্য,
মৃত্যুর পরে তারা হবে
সুখ-শান্তিতে ধন্য।
এসো সবাই তওবা করে
অপেক্ষাতে থাকি,
আসুক যখন মৃত্যুখানি
চাই না দিতে ফাঁকি।

নভেল করোনা

-মো. মোবায়েছ
বি.এ (অনার্স), ১ম বর্ষ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
আনন্দ মোহন বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

যার ললাটে লিখেছে প্রভু
করোনা মৃত্যু হায়,
যতই করুক চেষ্টা বাঁচার
পাবে না সে রেহায়।
মরণ যখন আসবে সখা
তার সমীপে ভাই,
করবে যতই অনুনয়-বিনয়,
মানবে না কোনো কথায়।
নিয়েই যাবে সঙ্গে তাকে
রাখবে না এই ভবে,
কোভিড যদিও মৃত্যুমুখী
বিষের মতন সে।
তাই বলে কি ভয় পাব
নভেল করোনাকে!
বরং ভয় পাব মোরা সবাই
করোনার স্রষ্টাকে।
ক্ষমতা সকল তাঁর হাতে তাই
তাঁর কাছে মোরা আশ্রয় চাই।
তাঁর কাছে করুণ সুরে
বলব মোরা কেঁদে,
দাওনা রেহাই মৃত্যুমুখী
করোনা গযব থেকে।

বাংলাদেশ সংবাদ

শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফের উপর প্রাণনাশক হামলার প্রতিবাদে 'মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ'

সালাফী মানহাজের বিজ্ঞ ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন, শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফের উপর সিলেটে বর্বরোচিত হামলার বিরুদ্ধে আজ ১৭/০২/২০২১ ইং রোজ বুধবার, বেলা ১১.০০ ঘটিকায় রাজশাহী মহানগরীর সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে শান্তিপূর্ণ 'মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। জাতির কাণ্ডারী উলামায়ে দ্বীনের উপর এহেন বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে শিক্ষক, ছাত্র, আলেম সমাজসহ সকল শ্রেণি ও পেশার সচেতন ধর্মপ্রাণ মুসলমান এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় অংশগ্রহণে মহানগরীর সাহেব বাজার জিরো পয়েন্ট এলাকা প্রতিবাদ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠে। সভা সঞ্চালনা করেন আল জামি'আহ আস সালাফিয়্যাহ-এর সিনিয়র শিক্ষক ইন্তাজ আলি খাঁ। সভায় উপস্থিত জনতার মাঝে বক্তব্য পেশ করেন ভাইস প্রিন্সিপাল মোস্তফা মাদানী, সিনিয়র মুহাদ্দিছ নজরুল ইসলাম, সিনিয়র শিক্ষক ড. ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর; মাসিক আল-ইতিছামের গবেষণা সহকারী আব্দুল বারী; নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সহ-সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক; উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী আল-আমীন; ফারেগ শিক্ষার্থী হাবীবুল্লাহ ও আব্দুল্লাহ রাসেল প্রমূখ।

সভায় বক্তাগণ শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফকে সালাফী মানহাজের সহজ-সরল ও উদার মনের অধিকারী, বিজ্ঞ ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন হিসাবে অভিহিত করেন। তিনি ১৯৯০ সাল থেকে তৃণমূল পর্যায়ে মাঠে-ময়দানে বক্তৃতা দিয়ে আসছেন, কোথাও তিনি কাউকে কটাক্ষ করে বা কোনো মাযহাবের বদনাম করে কথা বলেন না। তিনি সদা শান্তির কথা বলেন, তিনি জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে মুখে ও কলমে কঠোর ভূমিকা রেখেছেন। তিনি আক্রমণকারীদের ক্ষমা করে দিয়ে যে বিরল দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন তা বর্তমান সকলের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়।

বক্তাগণ তার উপর এহেন বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং কোনো আলেমে দ্বীনের উপর এরূপ ন্যক্কারজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে সে ব্যাপারে আহ্বান জানান। তারা আরও বলেন, আলেম সমাজের সাথে এরূপ হামলার ঘটনা রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য হুমকিস্বরূপ বলে আমরা মনে করি।

বক্তারা আরো বলেন, দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম সমাজ যেন তাদের অনুসারীগণকে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন এবং মতভিন্নতা থাকলেও কোনো মুসলিমের উপর হাত উঠানো যে কত ভয়াবহ অপরাধ সে বিষয়ে সচেতন করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ফুলতলী পীরের অনুসারী আঞ্জুমান তালামীযে ইসলাম নামক যে সংগঠনের সম্পৃক্ততার অভিযোগ উঠেছে তারা যদি সত্যিকারভাবে উক্ত ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত না থাকে, তাহলে তাদেরকে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করত উক্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি প্রদানের আহ্বান জানান।

তারা আরো বলেন, দেশে উলামা-মাশায়েখসহ সকল নাগরিকের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান কল্পে সরকার ও প্রশাসনের সতর্কদৃষ্টি এবং দুষ্কৃতিকারীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কামনা করেন। পরিশেষে উপস্থিত জনতা, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ ও প্রশাসনের নানা স্তরের বন্ধুদের ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের জিডিপি বাড়ছে

কোভিড-১৯ এর কারণে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা চলছে। এর মধ্যে ২০২০ সালে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে সামান্য হলেও বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বাড়ছে। জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২০ সালে বাংলাদেশের জিডিপি বেড়ে শূন্য দশমিক পাঁচ (০.৫) শতাংশে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বাংলাদেশের জিডিপি বাড়লেও ২০১৯ সালের পঞ্জিকা বছরের তুলনায় তা অনেক কমেছে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশের জিডিপি ছিল আট দশমিক চার শতাংশ। যেখানে ভারতের জিডিপি নয় দশমিক ছয় শতাংশ এবং পাকিস্তানের দুই দশমিক সাত শতাংশ। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি বেড়েছে চার দশমিক তিন শতাংশ, ভারতের কমে হয়েছে পাঁচ দশমিক সাত শতাংশ, পাকিস্তানের এক দশমিক দুই শতাংশ, ভুটানের শূন্য শতাংশ, নেপালের শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ। জাতিসংঘের প্রতিবেদন বলছে, চলতি অর্থবছরে অনেক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ঘুরে দাঁড়াবে। বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হবে পাঁচ দশমিক এক শতাংশ, ভারতের সাত শতাংশ, পাকিস্তানের শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ, ভুটানের তিন দশমিক পাঁচ শতাংশ, মালদ্বীপের নয় দশমিক নয় শতাংশ, আফগানিস্তানের চার দশমিক চার শতাংশ এবং শ্রীলঙ্কার তিন দশমিক এক শতাংশ।

www.al-itisam.com

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

পৃথিবীর প্রাচীনতম মসজিদের খোঁজ মিলেছে ইসরাঈলে

উত্তর ইসরাঈলী শহর টিবেরিয়াসের উপকণ্ঠে বিশ্বের প্রাচীনতম একটি মসজিদের সন্ধান পেয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকদের একটি দল। মসজিদটি গালীল সাগরের তীরে অবস্থিত। বাইজেন্টাইন যুগের একটি ভবনের সঙ্গে প্রাচীন ওই মসজিদের অংশবিশেষ পাওয়া যায় বলে একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, সপ্তম শতাব্দীতে সিরিয়ার অঞ্চলগুলো জয় করেছে এমন কোনো ছাহাবী ৬৩৫ সালে মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। ১৯৫০ সালে জায়গাটিতে প্রথম একটি পিলার আবিষ্কার করা হয়েছিল, যেটিকে বাইজেন্টাইন আমলের একটি বাজার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে ইসলামী মুদ্রা এবং মৃৎশিল্পের কিছু টুকরো সেখান থেকে আবিষ্কার করা হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকরা প্রথমে অষ্টম শতাব্দীর মসজিদ হিসেবে এ ধ্বংসাবশেষ চিহ্নিত করেছিলেন। তবে আরও খননকাজের পরে জানা যায় যে, এটির কাঠামো আরও প্রাচীন।

মুসলিম বিশ্ব

বিশ্বের অন্যতম স্বাস্থ্যসম্মত শহর মদীনা

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) সঊদী আরবের পবিত্র মদীনা নগরীকে বিশ্বের অন্যতম স্বাস্থ্যসম্মত শহর হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সংস্থাটির প্রতিনিধি দল শহরটি পরিদর্শন করে জানায়, স্বাস্থ্যকর শহরের বৈশ্বিক মানদণ্ডের সবই এখানে বাস্তবায়ন আছে। নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত নগর পরিসংখ্যানে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাকে ২২টি সরকারি সংস্থা, সামাজিক সংগঠন, দাতব্য সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবক দল সহায়তা করে। প্রসঙ্গত, পবিত্র মদীনা নগরীতে প্রায় ২০ লাখ মানুষ বসবাস করে। মনে করা হয় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর স্বাস্থ্যকর শহরের তালিকায় থাকা এটিই প্রথম জনবহুল শহর। ১৯৮৬ সালে প্রথম স্বাস্থ্যকর শহরের নাম ঘোষণা কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে বিশ্বে WHO ঘোষিত হাজারখানেক স্বাস্থ্যকর শহর আছে। মুহাম্মদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম অন্তত ১০ বছর এ শহরে কাটিয়েছেন।

বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত হবে মসজিদুল হারাম প্রাঙ্গণ

সঊদী আরবের পবিত্র মক্কায় অবস্থিত মসজিদে হারাম প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণের পরিকল্পনা নিয়েছে পবিত্র দুই মসজিদের পরিচালনা পরিষদ। পরিষদের প্রধান ড. শায়খ আব্দুর রহমান আল-সুদাইস এ পরিকল্পনা উন্মোচন করেছেন। জানা গেছে, পবিত্র কা'বা প্রাঙ্গণে ছালাত আদায়কারী মুছল্লী ও হজ্জ করতে আসা মানুষদের জীবন মানোন্নয়ন ও দেশটির সরকারের ভিশন-২০৩০ বাস্তবায়নের জন্য এই বৃক্ষরোপণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। শায়খ সুদাইস জলবায়ু ও পরিবেশ পরিবর্তন রোধে টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশটির দূষণ ও তাপমাত্রা হ্রাস করে পরিবেশের উন্নয়ন করা হবে। সেই ধারাবাহিকতায় এবার কাবার আশপাশের খালি এলাকায় বৃক্ষরোপণ করার মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব করা হবে। প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিচালনাগত দিক থেকে গবেষণা করা হবে, যাতে করে কা'বা প্রাঙ্গণে আসা মুছল্লীদের চলাফেরা বিঘ্নিত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

গড়ে একজন মানুষ পাঁচ হাজার চেহারা মনে রাখতে পারে

সবার চেহারা, রং একে অপরের চেয়ে ভিন্ন। তাহলে প্রশ্ন উঠতেই পারে, কতজনের চেহারা একজন মানুষের মনে থাকে? মানুষের মস্তিষ্ক অনেক কিছুই মনে রাখতে পারে। কিন্তু কী পরিমাণ এবং কয়দিন মনে রাখতে পারে, এ নিয়ে চলছে বিভিন্ন গবেষণা। আমাদের মস্তিষ্ক ঠিক কতজনের চেহারা ধারণ করতে সক্ষম? এর উত্তর জানলে বিস্মিত হবেন। সাম্প্রতিক এক গবেষণা জানিয়েছে, একটা মানুষ গড়ে পাঁচ হাজার চেহারা মনে রাখতে পারে। এ গবেষণায় বলা হয় মানুষের মুখাবয়ব চিহ্নিতকরণ সক্ষমতা অনেক। প্রায় পাঁচ হাজার চেহারা মনে রাখতে পারে মানুষ। আধুনিক যুগে আমরা শুধু প্রত্যক্ষ বা মুখোমুখি যোগাযোগই করি না, আন্তর্জাতিক যোগাযোগও করি। সেখানে বহু মানুষের সঙ্গে পরিচিত হই। ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম ভার্চুয়াল এ যুগে অনেকের সঙ্গে আমাদের খুব সখ্য, কিন্তু কখনো দেখা হয়নি একটিবারও। তবুও তাদের চেহারা চিহ্নিত করতে পারে মানুষ।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

কুরআন

প্রশ্ন (১) : মোবাইলের রিংটোন হিসাবে কুরআন মাজীদের আয়াতকে ব্যবহার করা যাবে কি?

-আব্দুন নূর
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী।

উত্তর : না, যাবে না। কেননা এটি মহান আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিলকৃত অতীব সম্মানিত আল্লাহর কালাম, যার অসম্মান করা জঘন্যতম অপরাধ। আর এতে কুরআন মাজীদের অবমাননা হয়। কারণ এতে আয়াত ও শব্দের যে কোনো স্থানে থামিয়ে দেওয়া হতে পারে। পবিত্র-অপবিত্র যে কোনো স্থানে এবং আগ্রহী-অনাগ্রহী যে কোনো ব্যক্তির কাছে তেলাওয়াত হতে পারে, যা অনুচিত (ছহীহ বুখারী, হা/৬৩৩৭; মিশকাত, হা/২৫২) এবং কুরআনের জন্য অসম্মানজনক। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয়ই এটি সম্মানিত কুরআন, যা ছিল সুরক্ষিত কিতাবে, পূত-পবিত্রগণ ব্যতীত যাতে কেউ স্পর্শ করে না, যা বিশ্বপ্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ' (আল-ওয়াক্বিআ, ৫৬/৭৭-৮০)।

প্রশ্ন (২) : সূরা আন-নূর এর ২৬ নং আয়াত (اَلْخَبِيْثَاتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ)-এর ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা কী?

-ওমর ফারুক
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : আয়াতের অনুবাদ : 'দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য, দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য, সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য। লোকে যা বলে এরা তা থেকে পবিত্র। এদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা' (আন-নূর, ২৪/২৬)। আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : উক্ত আয়াতটি ইফকের ঘটনায় আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর প্রতি অপবাদের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। অপবাদ রটানোর ঘটনায় কিছু সরলপ্রাণ মুসলিমও জড়িত হয়ে পড়েন। তাদের মধ্যে আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর দরিদ্র আত্মীয় মিসতাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও ছিলেন। যাকে আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আর্থিক সহযোগিতা করতেন। এ ঘটনার পর তিনি তাকে সাহায্য করা বন্ধ করে দিলে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই আয়াতে أُولَئِكَ দ্বারা চরিত্রবান নারী-পুরুষ তথা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ও ইফকের ঘটনায় যাদের অপবাদ দেওয়া হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে (তাফসীর ইবনু কাছীর, সূরা আন-নূর এর ২৬ নং আয়েতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

প্রশ্ন (৩) : অমুসলিমরা কি কুরআন স্পর্শ করতে ও পড়তে পারবে?

-শাহাদত
আত্রাই, নওগা।

উত্তর : না, অমুসলিমরা কুরআন স্পর্শ করতে ও পড়তে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয় মুশরিকরা নাপাক, সুতরাং তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয় (আত-তওবা, ৯/২৮)। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, 'পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না' (আল-ওয়াক্বিআ, ৫৬/৭৯)। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাফের কর্তৃক কুরআন অসম্মানের ভয়ে কুরআন নিয়ে কাফেরদের দেশে যেতে নিষেধ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরআন সঙ্গে নিয়ে শত্রুর দেশে সফর করতে নিষেধ করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৯৯০, ছহীহ মুসলিম, হা/৪৯৪৭)।

ঈমান-আক্বীদা

প্রশ্ন (৪) : কিয়ামতের দিন পাপ-পুণ্য পরিমাপের তুলাদণ্ড বা মীযান বলে কিছু থাকবে কি?

-আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : হ্যাঁ, থাকবে। এর প্রমাণে মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি কিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের মীযান স্থাপন করব' (আল-আম্বিয়া, ২১/৪৭; আল-ক্বারিআ, ১০১/৬-৮)। আবূ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মুমিনের জন্য মীযানের পাল্লায় ভালো ব্যহারের চেয়ে অধিক ভারী আর কিছু হবে না। আল্লাহ তাআলা অশ্লীল এবং কটুভাষীকে অবশ্যই ঘৃণা করেন (তিরমিযী, হা/২০০২; সিলসিলা ছহীহা, হা/৮৭৬)। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, দুটি কালেমা জিহ্বার উপর (উচ্চারণে) খুবই হালকা, মীযানের (পাল্লায়) অত্যান্ত ভারী, রহমান (পরম দয়ালু আল্লাহ) এর কাছে খুবই প্রিয়। তা হলো, سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ (আমি আল্লাহ তাআলার জন্য সপ্রশংসা পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি, আমি মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি) (ছহীহ বুখারী, হা/৬৬৮২; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৪)।

www.al-itisam.com

প্রশ্ন (৫) : যারা কুরআন মানে কিন্তু হাদীছ মানতে চায় না, তারা কি মুসলিম?

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : ভারত উপমহাদেশে আত্মপ্রকাশকারী একটি ভ্রান্ত ফেরক্বার নাম 'আহলে কুরআন'। এরা অতীতের ভ্রান্ত ফেরক্বা খারেজী ও রাফেযীদের নতুন রূপ। তাদের মতে, কুরআনই সকল সমস্যা সমাধানের পূর্ণাঙ্গ উৎস। হাদীছ মানার কোনো প্রয়োজন নেই। অথচ এই বিশ্বাস চরম গোমরাহী ছাড়া কিছুই নয়। একথা স্বীকার করার অর্থ হলো- কুরআনকেই অস্বীকার করা। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো' (আল-হাশর, ৫৯/৭)। এখানে আল্লাহ তাআলা রাসূলের বাণীকে গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছেন। কুরআন ও হাদীছ দুটিই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ অহী। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের থেকে কোনো কথা বলতেন না, যা বলতেন সবকিছু অহী থেকেই বলতেন (আন-নাজম, ৫৩/৩-৪)। মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো ফয়ছালা দিলে কোনো মুমিন নারী-পুরুষের জন্য সে ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করার অধিকার নেই' (আল-আহযাব, ৩৩/৩৬)। তাছাড়া আল্লাহ হাদীছ নাযিল করেছেন কুরআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ। তাহলে হাদীছকে ছেড়ে কুরআন বুঝা সম্ভব হয় কীভাবে? আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে' (আন-নাহল, ১৬/৪৪)। যারা এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের দাবিদার কুরআন তাদের বিপক্ষেই সাক্ষ্য দিচ্ছে। বিধায় এমন আক্বীদায় বিশ্বাস করা নিশ্চিত কুফরী। তাই যারা এই বিশ্বাস লালন করে তারা স্পষ্টত কাফের।

প্রশ্ন (৬) : রূহ মানব দেহের কোন স্থানে অবস্থান করে?

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : মানব দেহে রূহ আছে একথা কুরআন হাদীছের অসংখ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। তবে দেহের মাঝে কোথায় রূহ অবস্থান করে, তার গঠন কেমন, তার প্রকৃতি কেমন ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। তৎকালীন কাফেররা মুহাম্মাদ ﷺ-কে এমর্মে জিজ্ঞেস করলে মহান আল্লাহ আয়াত নাযিল করে বলেন, 'আর তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি তাদেরকে বলে দিন, রূহ হচ্ছে আমার রবের আদেশ মাত্র। আর তোমাদেরকে যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তা অতিসামান্য (আল-ইসরা, ১৭/৮৫)। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানব দেহে রূহ অবস্থান করে তবে তা কোথায় অবস্থান করে, দেখতে কেমন ইত্যাদি বিষয়গুলো অস্পষ্ট। আর এই বিষয়টি মানুষের জ্ঞানের শক্তির ঊর্ধ্বে। আরও প্রমাণ করে যে, রূহের বিষয়টি মানুষের আয়ত্বের বাইরে।

প্রশ্ন (৭) : 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান' কথাটা বলা যাবে কি?

-রনজু
সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'আল্লাহ সবকিছুর উপরে ক্ষমতাবান বা শক্তিমান'। এমর্মে কুরআন মাজীদের বহু আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 'নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান' (আল-বাক্বারা, ২০, ১০৬, ১০৯, ১৪৮, ২৪৯ প্রভৃতি)। এর মধ্যে শিরকের কোনো দিক পাওয়া যায় না। বিধায় এ কথা বলাতে শারঈ কোনো বাধা নেই।

প্রশ্ন (৮) : কেউ দাওয়াত দিলে তা কবুল করা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য। কিন্তু যদি সে দাওয়াত হয় চল্লিশা, জন্মদিন কিংবা বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাহলে কি তা কবুল করা জরুরী?

-নাজনীন পারভীন
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর : বর্তমান সমাজে মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে চল্লিশা, জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী ইত্যাদির নামে যে সব অনুষ্ঠান করা হয় তার সবই জঘন্যতম বিদআত। তাই চল্লিশা, জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনৈসলামিক কোনো অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করা যাবে না। কেননা এসব দাওয়াত গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে তাদের বিদআতী কাজে সহযোগিতা করা যা করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা তাক্বওয়া ও কল্যাণকর কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)। তাছাড়া তার পরিণামও অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূল ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো বিদআতীকে আশ্রয় দেয়, আল্লাহ তার প্রতি লা'নত করেছেন' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৯৮; মিশকাত, হা/৪০৭০)।

www.al-itisam.com

প্রশ্ন (৯) : তাবলীগ জামাআতের প্রচলিত কার্যক্রম ব্যতীত কোনো মসজিদে কয়েকজন দুই-চার দিন অবস্থান করে সেখানকার মানুষের মাঝে দাওয়াতী বা তাবলীগের কাজ করা যাবে কি?

-আনোয়ার হোসেন
ময়মনসিংহ সদর।

উত্তর : হ্যাঁ, দ্বীন শেখা বা শেখানোর জন্য, দ্বীনের প্রচার-প্রসারের জন্য বা অন্য যেকোনো শারঈ কারণে মসজিদে অবস্থান করা যায়। উক্ববা ইবনু আমের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (একদিন) মসজিদ প্রাঙ্গণে বসেছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বের হয়ে আসলেন ও (আমাদের) বললেন, তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন সকালে 'বুত্বহান' অথবা 'আক্বীক' বাজারে গিয়ে দু'টি বড় কুঁজওয়ালা উটনী কোনো অপরাধ সংঘটন ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ছাড়াই নিয়ে আসতে পছন্দ করবে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের প্রত্যেকেই এ কাজ করতে পছন্দ করবে। তখন তিনি বললেন, যদি তা-ই হয় তাহলে তোমাদের কেউ কোনো মসজিদে গিয়ে সকালে আল্লাহর কিতাবের দু'টি আয়াত (মানুষকে) শিক্ষা দেয় না বা (নিজে) শিক্ষাগ্রহণ করে না কেন? অথচ এ দু'টি আয়াত শিক্ষা দেওয়া তার জন্য দু'টি উটনী অথবা তিনটি আয়াত শিক্ষা দেওয়া তার জন্য তিনটি উটনী অথবা চারটি আয়াত শিক্ষা দেওয়া তার জন্য চারটি উটনীর চেয়েও উত্তম। সারকথা, কুরআনের যে কোনো সংখ্যক আয়াত, একই সংখ্যক উটনীর চেয়ে উত্তম' (ছহীহ মুসলিম, হা/৮০৩; ইবনু আবী শায়বা, হা/৩০০৭৪; ছহীহ আত-তারগীব, হা/১৪১৮; ছহীহ আল জামে', হা/২৬৯৭; মিশকাত, হা/২১১০)। মসজিদে অবস্থান করত ৭০ জন গরীব মুহাজির ছাহাবী। সর্বদায় মসজিদে অবস্থান করত, ঘুমাত এবং কুরআন-হাদীছের জ্ঞান চর্চা করত (মিরকাত, ২/৫৯৬, ৩/৯৫৯, হা/১২৮৯)। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফাতেমার বাড়িতে আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে না পেয়ে খোঁজ করলেন। অবশেষে তাঁকে মসজিদে শুয়ে থাকা অবস্থায় পেলেন। তিনি দেখলেন তার গায়ে মাটি লেগে আছে। তখন তিনি তার গায়ের মাটি মুছে দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন, হে মাটির পিতা! উঠো (ছহীহ বুখারী, হা/৬২৮০; ছহীহ মুসলিম, হা/২৪০৯)। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) যখন অবিবাহিত ছিলেন তখন তিনি মসজিদে নববীতে ঘুমাতেন। তার কোনো পরিবার-পরিজন ছিল না (ছহীহ বুখারী, হা/৪৪০; নাসাঈ, হা/৭৬২)। ছাহাবীদের মধ্যে যারা আহলে ছুফফা ছিলেন, তাদের কোনো ঘর-বাড়ি না থাকায় নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের মসজিদে অবস্থান করার অনুমিতি প্রদান করেছিলেন (ছহীহ বুখারী 'মসজিদে পুরুষদের নিদ্রা যাওয়া' পরিচ্ছেদ)।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (১০) : কয়েক মাস থেকে ১৫/১৬ দিন পরপর ঋতুস্রাব হচ্ছে এবং তার মেয়াদ থাকছে প্রায় ৭ থেকে ১০ দিন। এমতাবস্থায় করণীয় কী?

-রুবিনা বিনতে রফীকুল
ডিমলা, নীলফামারী।

উত্তর : এমতাবস্থায় ঋতুর প্রারম্ভের সময়গুলো লক্ষণীয়। প্রথমদিকে যে ক'দিনে ঋতুস্রাব বন্ধ হতো, এখন সে কয়েকদিনই ঋতু হিসাবে গণ্য হবে। এই দিনগুলো পার হওয়ার পর পূর্বের ন্যায় ছালাত পড়তে হবে। কেননা ফাতেমা বিনতে আবূ হুবায়শ রক্তজনিত রোগের অভিযোগ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ২৩-২৪ দিন পবিত্রতা হিসাবে গণ্য করতে বলে বাকি ৬/৭ দিন ঋতু হিসাবে গণ্য করতে বললেন এবং এ কথাও বললেন, ৬/৭ দিন পর গোসল করে ছালাত আদায় করবে। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতেমা বিনতে আবূ হুবায়শ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন রক্তপ্রদর রোগগ্রস্তা (ইস্তিহাযা) মহিলা। আমি কখনো পবিত্র হতে পারি না। এমতাবস্থায় আমি কি ছালাত পরিত্যাগ করব?' আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'না, এ তো শিরা হতে নির্গত রক্ত; হায়েয নয়। তাই যখন তোমার হায়েয আসবে তখন ছালাত ছেড়ে দিয়ো। আর যখন তা বন্ধ হবে তখন রক্ত ধুয়ে ফেলবে, তারপর ছালাত আদায় করবে' (ছহীহ বুখারী, হা/২২৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৩৩)।

প্রশ্ন (১১) : আমি রঙের কাজ করার সময় দেহের বিভিন্ন স্থানে রং লেগে থাকে। রঙের এই প্রলেপ নিয়েই ওযূ করি। উক্ত ওযূ দ্বারা ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-রবিউল হাছান রিপন
মাসকাট, ওমান।

উত্তর : ওযূ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ওযূর অঙ্গসমূহে পানি পৌঁছানো জরুরী। সুতরাং রঙের প্রলেপ যদি এমন হয় যে, তার কারণে ওযূর কোনো একটি বা সামন্যতম স্থানে পানি পৌঁছায়নি, তাহলে ওযূ এবং ছালাত কোনোটিই হবে না। কেননা নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ত্বকে পানি পৌঁছাতে নির্দেশ দিয়েছেন। আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি ওযূ করে নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হলো কিন্তু (ওযূতে) তার পায়ে নখ পরিমাণ জায়গা শুকনো ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, 'ফিরে যাও এবং উত্তমরূপে আবার ওযূ করে এসো (আবূ দাঊদ, হা/৩৩২)।

ইবাদত→ছালাত

প্রশ্ন (১২) : শুধু জুব্বা পরিধান করে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আব্দুন নূর
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী।

উত্তর : হ্যাঁ, যাবে। কেননা শুধু এক কাপড়েও ছালাত আদায় করা যায়। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করেন, এক কাপড়ে ছালাত হবে কি? তদুত্তরে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তোমাদের প্রত্যেকের কি দু'খানা কাপড় রয়েছে? (ছহীহ বুখারী, হা/৩৫৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৫২; আবূ দাঊদ, হা/৬২৫; মুওয়াত্ত্বা ইবনু মালেক, হা/৪৬৫)। তবে বস্ত্রের সমস্যা না থাকলে ভালো কাপড় পরে সুন্দর বেশভূষা ধারণ করে ছালাত আদায় করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে বনী আদম! প্রত্যেক ছালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরবে, আহার করবে, পান করবে; কিন্তু অপচয় করবে না' (আল-আ'রাফ, ৭/৩১)।

প্রশ্ন (১৩) : জুমআর আযানের সময় সুন্নাত পড়া যাবে কি?

-আনিসুরা খাতুন
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : আযান চলাকালীন সুন্নাত না পড়ে বরং আযানের জওয়াব দেওয়া ও আযান শেষের দু'আ পড়া উত্তম। আযানের জওয়াব ও দু'আ শেষে সুন্নাত পড়বে। কারণ এ ইবাদত চলন্ত অবস্থায় রয়েছে যার উত্তর দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদেশ করেছেন এবং তার অনেক ফযীলতও রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনে আছ (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যখন তোমরা মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন তার জওয়াবে বলো মুয়াযযিন যা বলে। অতঃপর আমার উপর দরূদ পড়ো। কেননা যে আমার উপর একবার দরূদ পড়ে, আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। তারপর আমার জন্য আল্লাহর নিকট 'অসীলা' চাও। আর তা হচ্ছে জান্নাতের একটি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন স্থান, যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে মাত্র একজন বান্দার জন্য উপযোগী। আমি আশা করি আমিই সেই বান্দা। যে ব্যক্তি আমার জন্য 'অসীলা' চাইবে তার জন্য আমার শাফাআত যরূরী হয়ে যাবে (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৮৪; মিশকাত, হা/৬৫৭; ফাতাওয়া উছায়মীন, ১২/১৯৩)। অতঃপর আযানের দু'আ পড়ার পর তাহিয়্যাতুল মসজিদ ছালাত আদায় করে বসবে (ছহীহ বুখারী, হা/৪৪৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৭১৪; মিশকাত, হা/৭০৪; ফাতাওয়া উছায়মীন, ১২/১৯৩)।

প্রশ্ন (১৪) : বসে খুৎবা দেওয়া কি শরীআতসম্মত?

-নিয়ামুল হাসান
শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : জুমআর খুৎবা দাঁড়িয়েই দিতে হবে। জাবের ইবনু সামুরা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। মাঝে একবার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বসতেন, অতঃপর (দ্বিতীয় খুৎবা দিতে) দাঁড়াতেন (নাসাঈ, হা/১৪১৭)। তবে নির্ধারিত খত্বীবের পক্ষে দাঁড়িয়ে খুৎবা দেওয়া সম্ভব না হলে অন্য কেউ খুৎবা দিবেন।

প্রশ্ন (১৫) : হানাফী ইমাম ক্বিরাআতে ভুল করে ভুল ত্বরীকায় সাহু সিজদা দেয়। তখন আমার করণীয় কী? আমি কি তাদের সাথে ভুল কাজ করব না সালাম ফিরিয়ে ছালাত শেষ করব?

-রবিউল হাছান রিপন
মাসকাট, ওমান।

উত্তর : ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণের জন্য। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ 'ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য' (ছহীহ বুখারী, হা/৭৩৪; মিশকাত, হা/৮৫৭)। সুতরাং, ইমামের পূর্বে কোনো কাজ করা বৈধ নয়। আবূ মূসা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমি এখন ভারী হয়ে গেছি। অতএব, আমি যখন রুকূ করি, তোমরাও তখন রুকূ করো এবং আমি যখন মাথা উঠাই, তোমরাও তখন মাথা উঠাও। আমি যখন সিজদা করি, তোমরাও তখন সিজদা করো। আমি যেন কোনো ব্যক্তিকে আমার আগে রুকূ ও সিজদায় যেতে না দেখি (ইবনু মাজাহ, হা/৯৫২)। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন ইমামের পূর্বে মাথা উঠিয়ে ফেলে, তখন সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তাআলা তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিণত করে দিবেন, তার আকৃতি গাধার আকৃতি করে দেবেন (ছহীহ বুখারী, হা/৬৫০)। উল্লেখিত হাদীছসমূহ থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, ইমামের পূর্বে কোনো কাজ করলে ইমামের অনুসরণ করা হয় না। সুতরাং, এমন পরিস্থিতিতে ইমামের সাথে সাহু সিজদা দিয়ে তার সাথেই সালাম ফিরিয়ে ছালাত শেষ করবে। উল্লেখ্য, ছালাতে ইমামের ত্রুটি হলে তা ইমামের উপর বর্তাবে মুক্তাদীর উপর নয় (ছহীহ বুখারী, হা/৬৯৪; মিশকাত, হা/১১৩৩)।

প্রশ্ন (১৬) : ফজরের জামাআতের এক রাকআত পেলে দ্বিতীয় রাকআতে উঠে রাফউল ইয়াদায়েন করতে হবে কি?

-ইমন ফারুক
মান্দা, নওগাঁ।

www.al-itisam.com

উত্তর : না, রাফউল ইয়াদায়েন করতে হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ছালাতের মধ্যে চারটি স্থানে রাফউল ইয়াদাইন বা হাত উত্তোলন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তা হলো, তাকবীরে তাহরীমা, রুকূতে যাওয়া, রুকূ হতে উঠা এবং দ্বিতীয় রাকআতের পর তৃতীয় রাকআতে উঠার সময়। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, 'রাসূল ﷺ যখন ছালাত শুরু করতেন, তখন তাঁর দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। অনুরূপ করতেন রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ থেকে উঠার সময়' (ছহীহ বুখারী, হা/৭৩৫; ইবনু মাজাহ, হা/৮৭৬; মিশকাত, হা/৭৯৩)। অপর বর্ণণায় আছে, 'যখন তিনি দুই রাকআত সম্পন্ন করে দাঁড়াতেন, তখনও দুই হাত উঠাতেন' (ছহীহ বুখারী, হা/৭৩৯; আবূ দাঊদ, হা/৭৪১; মিশকাত, হা/৭৯৪)।

প্রশ্ন (১৭) : ফজরের ছালাতের সময় যদি কেউ ঘুম হতে জাগতে না পারে, তাহলে সূর্য উঠার সময় বা সূর্য উঠার পর সে ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-শহীদুযযামান
ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তর : উক্ত ছালাত আদায় করার জন্য সূর্য উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না, বরং ঘুম ভাঙা মাত্রই ছালাত আদায় করতে হবে। যখনই ঘুম ভাঙবে বা স্মরণ হবে তখনই ক্বাযা ছালাত আদায় করে নিবে। ফরয ছালাত আদায়ের জন্য যেমন নিষিদ্ধ কোনো সময় নেই তেমনি অপেক্ষা করারও কোনো সুযোগ নেই। আবূ ক্বাতাদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো ছালাত ভুলে গেলে অথবা ছালাত না পড়ে ঘুমিয়ে গেলে যখনই স্মরণ হবে তখনই যেন আদায় করে নেয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৮১; মিশকাত, হা/৬০৪)।

প্রশ্ন (১৮) : কোনো ঘরে যদি গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি ইত্যাদির মল-মূত্র থাকে এবং তা দিনের বেলায় পরিষ্কার করা হলো কিন্তু ফজর ছালাতের সময় পরিষ্কার করা সম্ভব না হয়, তাহলে ঐ ঘরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মিম
নরসিংদী।

উত্তর : এমতাবস্থায় ছালাত আদায় করা যাবে। কেননা গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি ইত্যাদি হালাল প্রাণী। আর যে সমস্ত প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল, তার মল-মূত্র পবিত্র। যেমন, নবী করীম ﷺ-কে ছাগলের আবাসস্থলে ছালাত আদায়ের বৈধতা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, সেখানে ছালাত আদায় করো। কেননা সেটা বরকতময় প্রাণী বা বরকতময় স্থান' (আবূ দাঊদ, হা/১৮৪, হাদীছ ছহীহ)। তাছাড়া খোদ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মসজিদ নির্মাণের পূর্বে ছাগলের আবাসস্থলে ছালাত আদায় করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৩৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৫২৪)। আর এ কথা সবার জানা যে, ছাগলের আবাসস্থলে সাধারণত মল-মূত্র থাকেই তবে সম্ভবপর পরিষ্কার করার চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্ন (১৯) : ফরয ছালাতের ইক্বামত শুনে যে সুন্নাত ছেড়ে দেওয়া হয় সেটা কি পুনরায় আদায় করতে হবে?

-শহিদুল ইসলাম
পিরুজালী, গাজীপুর।

উত্তর : উক্ত ছালাত পুনরায় পড়তে হবে। কেননা ছেড়ে দেওয়া ছালাত পূর্ণ হিসাবে গণ্য হয় না, বরং তা ক্বাযা হয়ে যায়। আর সুন্নাতের ক্বাযা আদায়েরও বিধান রয়েছে (নাসাঈ, হা/৬৬১; মিশকাত, হা/৬৮৭, সনদ ছহীহ)।

প্রশ্ন (২০) : জামাআতে ছালাত আদায়কালে দুই এক রাকআত ছুটে গেলে কি ইমামের সাথে শেষ বৈঠকে সবগুলো দু'আ পড়তে হবে?

-শাকিল হুসাইন
চরগগনপুর, জামালপুর।

উত্তর : জামাআতে ছালাত আদায়কালে দুই এক রাকআত ছুটে গেলে ইমামের সাথে শেষ বৈঠকে সবগুলো দুআই পড়তে হবে। আলী ও মুআয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের কোনো লোক যখন জামাআতের ছালাতে শরীক হওয়ার জন্য আসবে তখন ইমাম যে অবস্থায় থাকবে ও যে কাজ করবে সেও সে কাজ করবে' (আবূ দাঊদ, হা/৫২২; তিরমিযী, হা/৫৯১; ছহীহ আল-জামে', হা/২৬১; মিশকাত, হা/১১৪২)।

প্রশ্ন (২১) : আযান হওয়ার আগে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-নাজনীন পারভীন
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর : যদি ছালাতের ওয়াক্ত হয়ে যায়, তাহলে আযান না হলেও ছালাত আদায় করা যাবে। আবূ যার রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, 'সে সময় তুমি কী করবে যখন তোমাদের ওপর শাসকবৃন্দ এমন হবে, যারা ছালাতের প্রতি অমনোযোগী হবে অথবা তা সঠিক সময় হতে পিছিয়ে দিবে?' আমি বললাম, আপনি আমাকে কী নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, 'এ সময়ে তুমি তোমার ছালাতকে সঠিক সময়ে আদায় করে নিবে। অতঃপর তাদের সাথে যা পাও, তা আবার আদায় করবে। এ ছালাত তোমার জন্য নফল হিসাবে গণ্য হবে' (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৪৮; আবূ দাঊদ, হা/৪৩১; ইবনু মাজাহ, হা/১২৫৬; তিরমিযী, হা/১৭৬; মিশকাত, হা/৬০০)।

www.al-itisam.com

প্রশ্ন (২২) : জামাআতে শরীক হয়ে ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়েছি। হঠাৎ মনে হলো, আমাকে আরও এক রাকআত ছালাত আদায় করতে হবে। প্রশ্ন হলো, এই এক রাকআত আদায় করার সময় শুরুতে কি পুনরায় ছানা পড়তে হবে?

-আব্দুল্লাহ
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : না, ছানা পড়তে হবে না। বরং বাকি ছালাত আদায় করে সাহু সিজদা দিয়ে সালাম ফিরাবে। আবূ বাকাতাদা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম। হঠাৎ তিনি লোকদের (আগমনের) আওয়াজ শুনতে পেলেন। ছালাত শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কী হয়েছিল? তাঁরা বললেন, আমরা ছালাতের জন্য তাড়াহুড়া করে আসছিলাম। নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'এরূপ করবে না। যখন ছালাতে আসবে ধীরস্থিরভাবে আসবে (ইমামের সাথে) যতটুকু পাবে আদায় করবে, আর যতটুকু ছুটে যায় তা (ইমামের সালাম ফিরানোর পর) পূর্ণ করবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৩৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৬০২; মুসনাদে আহমাদ, হা/২২৬৭১)।

উল্লেখ্য যে, মাসবূক ইমামের সাথে যে রাকআত পায় তা তার প্রথম রাকআত হিসাবে গণ্য (দারাকুতনী, হা/১৫১৫)। আর ছানা প্রথম রাকআতে পড়তে হয়। যেহেতু প্রথম রাকআত হয়ে গেছে সেহেতু মাসবূক বাকি ছালাত আদায় করার জন্য আর ছানা পড়বে না।

প্রশ্ন (২৩) : জুমআর দিন ইমাম সাহেব প্রথম খুৎবা দেওয়ার পর আরেকজন দ্বিতীয় খুৎবা দেন। এভাবে খুৎবা দেওয়া কি জায়েয?

-জুয়েল ইসলাম
ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তর : জুমআর দুই খুৎবা একজন খত্বীব দিবেন, এটাই সুন্নাত। কারণ রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সারাজীবন দুই খুৎবা একাই দিয়েছেন। তবে বিশেষ কোনো কারণে বা ইমামের কোনো দুর্ঘনা ঘটলে দুই জন খত্বীব খুৎবা দিতে পারেন (আশ শারহুল মুমতে', ৫/২৭; মারকাযুল ফাতাওয়া, ফতওয়া নং ১৫৬৭৪৫; ইসলাম সওয়াল ওয়া জওয়াব, ফতওয়া নং ১৩৬৬৯২)।

প্রশ্ন (২৪) : আমি একজন ব্যবসায়ী। সমস্যার কারণে জামাআতে প্রায়ই অংশগ্রহণ করতে পারি না; একাকী ছালাত পড়তে হয়। এতে কি আমার গুনাহ হবে?

-নুরুল হুদা
সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : শরীআতের বিধান হলো, সব কিছু ত্যাগ করে জামাআতে ছালাত আদায় করতে হবে। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, আমার মন চায় আযান হওয়ার পরও যারা জামাআতে আসে না, ইমামতির দায়িত্ব কাউকে দিয়ে আমি নিজে গিয়ে তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে আসি' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৪, ২৪২০; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৫১; মিশকাত, হা/১০৫৩)। তবে গ্রহণযোগ্য শারঈ কারণে জামাআতে অংশগ্রহণ করতে না পারলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানেই একাকী বা জামাআতের সাথে ছালাত আদায় করা যেতে পারে। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনল অথচ তার জবাব দিলো না ওযর ব্যতীত তার ছালাত কবুল হবে না' (ইবনু মাজাহ, হা/৭৯৩; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/৪২৬; দারাকুত্বনী, হা/১৫৫৫; মিশকাত, হা/১০৭৭)।

মৃত্যু-কবর-জানাযা

প্রশ্ন (২৫) : মুনাফিক্ব সরদার আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই মারা গেলে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি তার জানাযা দেওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন এবং মহান আল্লাহ তা করতে নিষেধ করেছিলেন?

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার জানাযা দেওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন এবং তার জানাযার ছালাতও আদায় করেন। তবে পরবর্তীতে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, মুনাফিক্ব সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই মৃত্যুবরণ করলে তার পুত্র আব্দুল্লাহ (যিনি ছাহাবী ছিলেন) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে বললেন, আপনার জামাটি আমাকে দান করুন। আমি সেটা দিয়ে আমার পিতার কাফন দিতে ইচ্ছা করেছি। আর আপনি তার জানাযা পড়াবেন এবং তার জন্য মাগফিরাত কামনা করবেন। নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের জামাটি তাকে দিলেন এবং বললেন, আমাকে খবর দিয়ো, আমি তার জানাযা আদায় করব। তিনি তাকে খবর দিলেন। যখন নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার জানাযা আদায়ের ইচ্ছা করলেন, তখন উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, আল্লাহ কি আপনাকে মুনাফিক্বের জানাযা আদায় করতে নিষেধ করেননি? তিনি বললেন, আমাকে তো দুটির মধ্যে কোনো একটি করার ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'আপনি তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন বা না করুন (একই কথা) আপনি যদি ৭০ বারও তাদের জন্য ক্ষমা চান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না' রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাহলে

www.al-itisam.com

আমি ৭০ বারের চেয়ে বেশি ক্ষমা চাইব (আত-তওবা, ৯/৮০)। কাজেই তিনি তার জানাযা পড়লেন। অতঃপর আয়াত নাযিল হলো, 'তাদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে আপনি কখনোই তাদের জানাযা আদায় করবেন না' (আত-তওবা, ৯/৮৪)।

প্রশ্ন (২৬) : কোনো হিজড়া মারা গেলে তাকে কয়টি কাপড়ে কাফন দিতে হবে? তাদের জানাযা ছালাত পড়ার নিয়ম কী?

-আনোয়ার হোসেন
কাশিমপুর, গাজীপুর।

উত্তর : হিজড়ারা পুরুষের অন্তর্ভুক্ত। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হিজড়ারা পুরুষের অন্তর্ভুক্ত (ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৮৬)। সুতরাং তারা মুসলিম হলে পুরুষের নিয়মেই তাদের জানাযার ছালাত পড়াতে হবে। ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, মানুষ পুরুষ হোক চাই নারী হোক সকলকেই তিনটি কাপড় দিয়ে কাফন পরাতে হবে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তিনটি সাদা সূতি কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে জামা ও পাগড়ি ছিল না (ছহীহ বুখারী, হা/১২৬৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৯৪১; মিশকাত, হা/১৬৩৫)। সুতরাং হিজড়াদের কাফনও তিনটি কাপড় দিয়ে দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, নারীদের পাঁচ কাপড়ে কাফন দেওয়ার হাদীছটি 'যঈফ' (যঈফ আবূ দাঊদ, হা/৩১৫৭)।

প্রশ্ন (২৭) : কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে তার উত্তরসূরীদের শরীআত বিরোধী কোনো অছিয়ত করে গেলে তা পালন করতে পারে কি?

-আনোয়ার হোসেন
কাশেমপুর, গাজীপুর।

উত্তর : শরীআত বিরোধী কিংবা যেকোনো পাপ কাজের অছিয়ত, মানত কিংবা কসম পূরণ করা যাবে না (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৪১; মিশকাত, হা/৩৪২৮)। আবূ আব্দুর রহমান আস-সুলামী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো সৃষ্টজীবের আনুগত্য চলবে না' (মুসনাদে আহমাদ, হা/১০৯৫; মিশকাত, হা/৩৬৯৬)।

ইবাদত→যিকির ও দু'আ

প্রশ্ন (২৮) : মৃত বা জীবিত উভয় অবস্থায় মাতা-পিতার জন্য 'রব্বির হামহুমা কামা রব্বাইয়ানী ছগীরা' দু'আ পড়া যাবে কি? নাকি মৃত মাতা-পিতার জন্য পৃথক কোনো দু'আ আছে?

-বাকী বিল্লাহ খান পলাশ
হাবেলী গোপালপুর, ফরিদপুর।

উত্তর : 'রব্বির হামহুমা কামা রব্বাইয়ানী ছগীরা' দু'আটি পিতা-মাতার জন্য সর্বাবস্থায় পড়া যাবে। কারণ আল্লাহ তাআলা উক্ত দু'আ পিতা-মাতার জন্যই অবতীর্ণ করেছেন, চাই তারা মৃত হন বা জীবিত হন। পিতা-মাতা যখন বার্ধক্যে উপনীত হন তখন তারা অপারগতায় পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন। সে কারণ সন্তানকে তাদের সেবা করতে হবে এবং তাদের জন্য উক্ত দু'আটি পড়তে হবে (বানী ইসরাঈল, ১৭/২৪)। তার মানে এই নয় যে, মৃত্যুর পরে তাদের জন্য আর এ দু'আটি পড়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তিনটি আমল ব্যতীত তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। তার মধ্যে একটি হলো, ঐ নেক সন্তান যে তার মৃত পিতা-মাতার জন্য দু'আ করে' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৩১; মিশকাত, হা/২০৩)। উক্ত দু'আর পাশাপাশি তাদের জন্য নিচের দু'আটিও পড়া যায়। যেমন, رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ 'রব্বানাগফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া ওয়া লিলমুমিনীনা ইয়াওমা ইয়াকূমুল হিসাব' (ইবরাহীম, ১৪/৪১)। এছাড়া মৃত পিতা-মাতার জন্য জানাযায় পঠিত 'আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়ার হামহু..' এবং 'আল্লাহুম্মাগ ফির লি হাইয়িনা ...' দু'আগুলোও পড়া যাবে। উক্ত দু'আগুলো ছালাতের মধ্যে তাশাহহুদ ও দরূদ পড়ার পর সালামের পূর্বে পাঠ করা যাবে। আবার ছালাতের বাইরে অন্য সময়েও একাকী হাত তুলে উক্ত দু'আগুলোসহ নিজ ভাষাতেও পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা চেয়ে দু'আ করা যাবে। উল্লেখ্য, দু'আ শেষে হাত দ্বারা মুখ মাসাহ করার হাদীছটি যঈফ (আবূ দাঊদ, হা/১৪৯২; মিশকাত, হা/২২৫৫)। তাই মুখে হাত না মুছে ছেড়ে দিবে।

প্রশ্ন (২৯) : তিরমিযীর ২৮৯৮ নং হাদীছে বলা হয়েছে যে, 'যে ব্যক্তি প্রতিদিন ২০০ বার সূরা ইখলাছ পাঠ করবে তার ৫০ বছরের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে, তবে ঋণ ব্যতীত'-এ হাদীছটি কি ছহীহ?

-নিঝুম তাবাসসুম
রাজশাহী।

উত্তর : সূরা ইখলাছ পড়ার উল্লেখিত ফযীলত সম্পর্কে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া সূরা ইখলাছ ৫০, ১০০, কিংবা ২০০ বার পাঠ করার ফযীলত সম্পর্কে যে সকল হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলোই যঈফ' (তিরমিযী, হা/২৮৯৮; সিলসিলা যঈফা, হা/৩০০; মিশকাত, হা/২১৫৮-৫৯)। তবে সূরা ইখলাছ পাঠের অনন্য ফযীলত রয়েছে। যেমন- রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সূরা ইখলাছ একবার পড়লে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠের সমান ছওয়াব পাওয়া যায়' (ছহীহ মুসলিম, হা/৮১১; ছহীহ বুখারী, হা/৫০১৩; মিশকাত, হা/২১২৭)। এ ছাড়া যে ব্যক্তি ১০ বার সূরা ইখলাছ পাঠ করবে,

www.al-itisam.com

আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন' (মুসনাদে আহমাদ, সিলসিলা ছহীহা, হা/৫৮৯; ছহীহুল জামে', হা/৬৪৭২)। যে ব্যক্তি সূরা ইখলাছকে পছন্দ করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে' (তিরমিযী, হা/১৯০১; মিশকাত, হা/২১৩০)। সূরা ইখলাছের তাৎপর্য হলো- তাওহীদকে সঠিকভাবে বুঝা ও সে অনুযায়ী আমল করা।

প্রশ্ন (৩০) : রাসূলুল্লাহ ﷺ দৈনিক ১০০ বার ইস্তিগফার পাঠ করতেন। আমরা যদি তার চেয়ে বেশি পাঠ করি তাহলে কি তা বিদআত হবে?

-নাজনীন আকতার
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর : না, বিদআত হবে না। দিনে ১০০ বার ক্ষমা চাওয়া মর্মে বর্ণিত হাদীছটি দ্বারা উম্মাহকে বেশি বেশি ইস্তিগফার করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করাই হচ্ছে মূলত হাদীছ দ্বারা উদ্দেশ্য ১০০ বারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়। যেমন অপর এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ভালোবাসে যে, সে তার আমলনামা দেখে আনন্দিত হবে, যে যেন বেশি বেশি ইস্তিগফার করে' (সিলসিলা ছহীহা, হা/২২৯৯; আল-মু'জামুল আওসাত্ব, হা/৮৩৯)। আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার আমলনামায় অধিক পরিমাণে 'ক্ষমা প্রার্থনা' যোগ করতে পেরেছে, তার জন্য সুসংবাদ, আনন্দ (ইবনু মাজাহ, হা/৩৮১৮; মিশকাত, হা/২৩৫৬)। উল্লিখিত হাদীছ দুটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বেশি বেশি ইস্তিগফার করতে হবে এবং ইস্তিগফারকে কোনো সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যাবে না। তাই আমাদের উচিত হবে বেশি বেশি আল্লাহর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া।

ইবাদত→যাকাত-ছাদাক্বা

প্রশ্ন (৩১) : এমন একজন বিধবা মহিলা যে পর্দা করে না, ছালাত আদায় করে না, তার কোনো সন্তান নেই, এবং সে লোকের বাড়িতে কাজ করে খায়। তার একটি অঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে, এমন মহিলাকে দান করা যাবে কি?

-নাজনীন পারভীন
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর : ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য ও ঈমানের উপর শক্তিশালী করার নিয়্যতে এমন অসহায় ব্যক্তিকে দান করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন, 'ছাদাক্বা হলো, ফক্বীর, মিসকীন ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য তাদের জন্য, দাসমুক্তি ও ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে (ব্যয়ের জন্য) আর মুসাফিরের জন্য। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয। আর আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী (আত-তওবা, ৯/৬০)। তাছাড়া কোনো ব্যক্তির শরীর শক্তিশালী করার চেয়ে তার ঈমানকে শক্তিশালী করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ (ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ৩৮৩)। তবে দানের সাথে সাথে তাকে ছালাত আদায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং পর্দা করতে আদেশ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সৎকর্ম ও আল্লাহভীরুতার কাজে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করো; পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করো না' (আল-মায়েদা, ৬/২)।

পারিবারিক বিধান→বিবাহ-তালাক

প্রশ্ন (৩২) : অমুসলিম মেয়েকে বিবাহ করলে তার অভিভাবকের অনুমতি লাগবে কি?

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : অমুসলিম থাকাবস্থায় কোনো মেয়েকে কোনো মুসলিম ছেলে বিবাহ করতে পারবে না (আল-বাক্বারা, ২/২২১)। তবে ইসলাম গ্রহণের পর বিবাহ করলে অমুসলিম পিতা মুসলিম মেয়ের অলী বা অভিভাবক হতে পারে না (আল-মুগনী, ৯/৩৭৭)। দ্বীন ভিন্ন হলে অভিভাবকত্ব বাতিল হয়ে যায়। তাই ইসলাম গ্রহণকারী কোনো মেয়েকে বিবাহ করার ক্ষেত্রে তার পিতার অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং মুসলিম শাসক কিংবা গভর্নর বা সামাজিক কোনো দায়িত্বশীল হবেন তার অভিভাবক। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যার কোনো অভিভাবক নেই, তার অভিভাবক হলেন দেশের শাসক' (আবূ দাঊদ, হা/২০৮৩; তিরমিযী, হা/১১০২; মিশকাত, হা/৩১৩১)।

প্রশ্ন (৩৩) : একজন বিবাহিত নারী তার দেবরের সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়। বিষয়টি জানাজানি হলে সাথে সাথে সে তার স্বামীকে তালাক দিয়ে দেবরকে বিয়ে করে। উক্ত বিবাহ কি জায়েয হবে? না হলে তাদের যে সন্তান জন্ম হয়েছে তার বিধান কী?

-শফীকুল ইসলাম

উত্তর : নারী-পুরুষের পদস্খলনের সবচেয়ে পিচ্ছিল পথ হলো দেবর-ভাবি। রাসূলুল্লাহ ﷺ দেবরকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫২৩২; ছহীহ মুসলিম, হা/২১৭২)। তাই দেবর থেকে দূরে থাকা প্রত্যেক বিবাহিত নারীর জন্য অপরিহার্য। দ্বিতীয়ত, বিবাহিত নারী-পুরুষ যেনায় লিপ্ত হলে

www.al-itisam.com

ইট-পাথর মেরে তাদের দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়া আর অবিবাহিত হলে ১০০ বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য এলাকা থেকে বিতাড়িত করে দেওয়াই হলো শরীআতের বিধান। তৃতীয়ত, স্ত্রীর তালাক দেওয়ার অধিকার নেই। তালাক দেওয়ার অধিকার একমাত্র স্বামীর (আত-তালাক, ৬৫/১)। বিধায় তার পক্ষ থেকে তালাক দেওয়া হলে তা তালাক বলে গণ্য হবে না। এই অবস্থায় তার দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল হবে (আন-নিসা, ৪/২৪)। চতুর্থত, তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, তালাক হয়েছে তাহলে তিন মাসিক ইদ্দত পালন করা ব্যতীত অন্য কোথাও বিবাহ বসতে পারবে না। যদি বিবাহ হয়ে যায় তাহলে সেই বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সাথে সাথে তাদের মাঝে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে। পঞ্চমত, তাদের ঘরে যে সন্তান এসেছে সেটা অবৈধ সন্তান হিসাবে বিবেচিত হবে। সেই সন্তান মায়ের মীরাছ পাবে; পিতার মীরাছের হক্কদার হবে না (তিরমিযী, হা/২১১৩; মিশকাত, হা/৩০৫৪)।

প্রশ্ন (৩৪) : আপন চাচাত ভাইয়ের মেয়ের সাথে বিবাহ শরীআতসম্মত হবে কি?

-আব্দুল্লাহ
সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তর : আপন চাচাত ভাইয়ের মেয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয। কুরআন মাজীদে বর্ণিত হারাম বা বিবাহ নিষিদ্ধ মহিলাদের মধ্যে উক্ত মহিলা অন্তর্ভুক্ত নয় (আন-নিসা, ৪/২৩)। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় কন্যা ফাতেমাকে তার চাচাত ভাই আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু –এর সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন (৩৫) : জনৈক ব্যক্তি বিয়ের পর যৌতুক হিসাবে কিছু টাকা নিয়েছিল। কিন্তু পরে বুঝতে পারে যে এটা তার অন্যায় হয়েছে। সে এখন যৌতুকের টাকা ফেরত দিতে চাই, কিন্তু তার বাবা-মা বলে টাকা পরে ফেরত দিতে, এমতাবস্থায় করণীয় কী? সে কি বাবা-মার কথা অমান্য করে টাকা ফেরত দিবে না-কি বাবা-মার কথা শুনে আরো কিছু দিন পর টাকা ফেরত দিবে?

-সবুজ
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : বর্তমান মুসলিম সমাজে স্ত্রীর কাছ থেকে যৌতুক গ্রহণের রীতি মূলত হিন্দুয়ানী রীতির অনুকরণ মাত্র। কেননা হিন্দু উত্তরাধিকার নীতিতে কন্যা সন্তান পিতা-মাতার সম্পত্তির অংশ পায় না। তাই বিয়ের সময় মেয়েকে সাধ্যমতো সবকিছু দিয়ে দেয়, যা যৌতুক নামে পরিচিত। পক্ষান্তরে ইসলামী বিধানে কন্যা সন্তান পিতা-মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। তাই এখানে বরং স্ত্রীকেই মোহর দেওয়া স্বামীর উপর ফরয। এটা স্রেফ স্ত্রীর হক্ক। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে নির্লোভ চিত্তে মোহর প্রদান করো। তবে যদি তারা সেখান থেকে স্বেচ্ছায় তোমাদের কিছু প্রদান করে, তাহলে তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করো (আন-নিসা, ৪/৪)। এক্ষণে স্ত্রীকে মোহর না দিয়ে উল্টা স্ত্রীর কাছ থেকে যৌতুক আদায় করা আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার শামিল। যার পরিণাম জাহান্নাম ব্যতীত কিছুই নয়। যদি কেউ এরূপ করে, তবে তাকে যৌতুক পুরোপুরি ফেরত দিয়ে অনুতপ্ত হৃদয়ে স্ত্রীর নিকট ক্ষমা চেয়ে আল্লাহর নিকট খালেছ মনে তওবা না করা পর্যন্ত তার গুনাহ মাফ হবে না। সুতরাং এমন জঘন্য পাপ থেকে মুক্তি লাভের জন্য বাবা-মার কথায় তা ফেরত দিতে বিলম্ব করা যাবে না। বরং বিষয়টি তাদেরকে বুঝানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। এরপরও যদি তারা তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে, তাহলে তাদের আদেশ অমান্য করায় শারঈ কোনো বাধা নেই। রাসূল ﷺ বলেন, 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির আনুগত্য নেই' (শারহুস সুন্নাহ, হা/২৪৫৫; মিশকাত, হা/৩৬৯৬)।

প্রশ্ন (৩৬) : ছেলেদের ক্ষেত্রে বাবার আপন ফুফু কি মাহরাম? আবার মেয়েদের ক্ষেত্রে বাবার আপন চাচা কি মাহরাম?

-মাহফুজুর রহমান
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ছেলেদের ক্ষেত্রে বাবার আপন ফুফু মাহরাম। কেননা বংশীয় সম্পর্কের কারণে আল্লাহ তাআলা যে সাত শ্রেণির নারীদের মাহরামের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, নিজ ফুফু তাদের অন্তর্ভুক্ত। এই মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের বোনদের, তোমাদের ফুফুগণ, তোমাদের খালাদের, এবং তোমাদের বোনদের' (আন-নিসা, ৪/২৩)। এ আয়াতে ফুফুগণ বলতে যাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারা হলেন, পিতা, দাদা ও নানার বোন। সুতরাং পিতার নিজ ফুফু অর্থাৎ সম্পর্কে দাদি মাহরামের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন (৩৭) : স্বামী যদি স্ত্রীকে ছেড়ে ছয় মাস অন্য কোথাও অবস্থান করে তাহলে তাদের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। এ কথা কি ঠিক?

-নাঈম ইসলাম
চৌমুহনি, বগুড়া।

উত্তর : না, এ কথা ঠিক নয়। এটি একটি ভিত্তিহীন কথা। রবং উভয়ের সম্মতিতে স্বামী তার স্ত্রীকে ছেড়ে দীর্ঘদিন থাকতে

www.al-itisam.com

পারে। তবে উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে ছেড়ে থাকার ব্যাপারে এরকম একটি বিবরণ পাওয়া যায় যে, একবার তিনি তাঁর মেয়ে হাফসা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, একজন নারী তার স্বামী ছাড়া কতদিন থাকতে পারে? তিনি উত্তর দিয়ে ছিলেন ছয় মাস বা চার মাস। তারপর থেকে তিনি কোনো সৈনিককে ছয় মাসের বেশি বাহিরে থাকতে দিতেন না (মারেফাতুস সুনান ওয়াল আছার লিল বায়হাক্বী, ১৪/২৪৯)। এ থেকে বুঝা যায় যে, বিশেষ প্রয়োজনে ছয় মাস স্ত্রী ছাড়া থাকা যায়। এর চেয়ে বেশি থাকলে স্ত্রীর সম্মতির প্রয়োজন আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'তোমাদের উপর তোমাদের নফসের হক্ব আছে, তোমাদের স্ত্রীর হক্ব আছে, তোমরা সবার হক্ব আদায় করবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬১৩৯)। তাই একান্ত অসুবিধায় না পড়লে স্ত্রী ও সন্তানদের দেখাশোনা করার যে দায়িত্ব প্রত্যেক স্বামীর রয়েছে তা পালনার্থে সকলকে নিয়ে একত্রে বসবাস করাই উত্তম।

প্রশ্ন (৩৮) : জনৈক ব্যক্তি বিবাহিতা এক নারীর সাথে যেনা করেছে। সে কি তার (ঐ নারীর) মেয়ের সাথে বিবাহ করতে পারে?

-আব্দুর রহীম
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : হ্যাঁ, মেয়েটিকে বিবাহ করতে পারে। কেননা মেয়েটি তাঁর জন্য মাহরাম বা বিবাহ হারাম এমন মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা যে সকল মহিলাকে বিবাহ করা হারাম তাদের বর্ণনা শেষান্তে মহান আল্লাহ বলেন, 'উল্লেখিত নারীগণ ব্যতীত বাকী সকল নারীকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে' (আন-নিসা, ৪/২৩)। সুতরাং এমন মেয়েকে বিবাহ করাতে শারঈ কোনো বাধা নেই। এ মর্মে আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যে কোনো মহিলার সাথে হারাম পন্থায় সহবাসে লিপ্ত হয়, অতঃপর ওই নারীর মেয়েকে বিবাহ করে অথবা কোনো মেয়ের সাথে যেনায় লিপ্ত হয় অতঃপর তার মাকে বিবাহ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'কোনো হারাম কাজ অন্য কোনো হালাল কাজকে হারাম করে না' (আল-উম্ম লিশ শাফেঈ, ৬/৩৯৮)।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৩৯) : কোনো ব্যক্তি লোন নিয়ে জমি কিনে সেই জমিতে বাড়ি করলে তার কোনো ইবাদত কবুল হবে কি?

-নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক

উত্তর : না, কবুল হবে না। কেননা সূদের ভিত্তিতে লোন নেওয়া এবং তা দিয়ে বাড়ি তৈরি করা উভয়ই হারাম। মহান আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সূদকে হারাম করেছেন (আল-বাক্বারা, ২/২৭৫)। জাবের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূদ গ্রহীতা, দাতা, তার লেখক ও সাক্ষ্যদাতার প্রতি লা'নত করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৬২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৮; মিশকাত, হা/২৮০৭)। আর হারাম অর্থের সাথে জড়িত থাকলে আল্লাহ তার ইবাদত কবুল করেন না। নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَايَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا 'নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ব্যতীত গ্রহণ করেন না' (ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৯৩; তিরমিযী, হা/২৯৮৯; মিশকাত, হা/২৭৬০)।

প্রশ্ন (৪০) : ইসলামে কুকুর পালন করা কি জায়েয?

-হাসানুজ্জামান
নওগাঁ।

উত্তর : তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত কুকুর পালন করা হারাম। উক্ত তিনটি ক্ষেত্র হলো, ১. গবাদি পশু পাহারা দেওয়ার জন্য, ২. ক্ষেত-খামার দেখাশুনার জন্য ৩. এবং শিকারের জন্য। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গৃহপালিত পশুর রক্ষক কুকুর অথবা শিকারী কুকুর অথবা কৃষি কাজের কুকুর ব্যতীত অন্য কোনো কুকুর পালন করবে তার আমল থেকে প্রতিদিন এক ক্বীরাত নেকী কমে যায়'। অপর বর্ণনায় আছে, 'দুই ক্বীরাত নেকী কমে যায়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৭৫; নাসাঈ, হা/৪২৯১)।

প্রশ্ন (৪১) : মেয়েরা কি হিজাব পরে নার্সিং-এ চাকরি করতে পারবে?

-সিয়াম
কাপাসিয়া, গাজীপুর।

উত্তর : কোনো পেশায় যদি গায়রে মাহরাম পুরুষের সাথে মেলামেশা না হয়, তাহলে মেয়েরা সে কাজ করাতে শরীআতে কোনো বাধা নেই। নার্সিং পেশা নারীদের সেবা প্রদানের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি পেশা। সুতরাং এ পেশায় যদি পরপুরুষের সাথে মেলামেশা হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে পূর্ণ পর্দা মেনে তা করা যেতে পারে। কিন্তু যদি তাতে পরপুরুষের সাথে মেলামেশা হয় এবং পর্দার ব্যাঘাত ঘটে তাহলে কোনো মুসলিম নারীর জন্য সে পেশায় যাওয়া বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর যখন তোমরা তাদের কাছে কোনো কিছু চাইবে, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে' (আল-আহযাব, ৩৩/৫৩)। তবে জরুরী কারণে কিংবা একান্ত বাধ্যগত অবস্থায় মেয়েরাও পুরুষদেরকে নার্সিং সেবা দিতে পারে। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, উহুদ যুদ্ধে আহত ছাহাবীদের সেবা করার

www.al-itisam.com

জন্য আয়েশা বিনতে আবি বকর এবং উম্মু সুলাইম (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) মশক ভর্তি পানি পিঠে করে বয়ে আনতেন এবং তাদের মুখে ঢেলে দিতেন আবার ফিরে যেতেন এবং মশক ভর্তি পানি এনে তাদের মুখে ঢেলে দিতেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৮৮০; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮১১)। তবে বর্তমানে নার্সিং পেশার যে অবস্থা তাতে তা বৈধ হবার কোনো সুযোগ নেই।

প্রশ্ন (৪২) : এ দেশের ৯৯.৯৯% আইন কুরআন-হাদীছের বিপরীত। এমতাবস্থায় আইন বিভাগে চাকরি করা যাবে কি?

-শুয়াইব
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : এ চাকরি হতে বিরত থাকতে হবে। কেননা এতে পাপ কাজে সহযোগিতা করা লাগে এবং মানব রচিত আইন মেনে নেওয়া লাগে। অথচ তা করতে মহান আল্লাহ নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, 'তোমরা তাক্বওয়া ও কল্যাণকর কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো; পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)।

প্রশ্ন (৪৩) : বোর্ড পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করলে বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যাংক এককালীন কিছু শিক্ষাবৃত্তি দিয়ে থাকে। এ টাকা গ্রহণ করা যাবে কি?

-আব্দুর রহমান
তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : কোনো সংস্থা বা ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করার বিষয়টি তাদের অর্থনৈতিক সোর্স এর উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল। সেই ব্যাংক বা সংস্থাটির ইনকাম সোর্স যদি অবৈধ তথা সূদী লেনদেন, অবৈধ ব্যবসা বা কারবারী ইত্যাদি হয়ে থাকে, তাহলে সে ব্যাংক বা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করা যাবে না। যেমন, স্ব-ঘোষিত সূদী ব্যাংক। কেননা ইহা অন্যায়ের কাজে সহযোগিতা। অন্যায়ের কাজে সহযোগিতা করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'সৎ ও আল্লাহভীতির কাজে একে অপরকে তোমরা সহযোগিতা করো; পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা' (আল-মায়েদা, ৫/২)। তবে কোনো বৈধ ব্যবসায়ী সংস্থা বা ব্যাংক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য এমন কোনো শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করলে তা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাবে এবং তা প্রশংসনীয়। বরং এমতাবস্থায় পুরস্কার দিয়েই শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে (ছহীহ বুখারী, হা/৪৩০২)।

ব্যবসা-বাণিজ্য

প্রশ্ন (৪৪) : দ্বিগুণ লাভে বা তার বেশি মূল্যে কোনো পণ্য বিক্রয় করা যাবে কি? শারঈ দৃষ্টিতে লাভের কোনো নির্ধারিত পরিমাণ আছে কি?

-ফারিহা খাতুন
সিংড়া, নাটোর।

উত্তর : লাভের কোনো নির্ধারিত সীমা নেই। চলতি বাজার দর হচ্ছে সীমা, যা চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। কোনো পণ্যের দাম বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি নিলে যুলুম করা হবে, যা হারাম। অনেক সময় ক্রয়মূল্যের চেয়ে বিক্রয়মূল্য দ্বিগুণও হতে পারে। একদা উরওয়া ইবনু আবিল জা'দ আল-বারেক্বী নামক জনৈক ছাহাবীকে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি দীনার প্রদান করেন একটি ছাগল ক্রয়ের জন্য। ছাহাবী তা দিয়ে দুটি ছাগল ক্রয় করেন এবং একটি বিক্রয় করেন এক দীনারে। অতঃপর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে একটি ছাগল ও একটি দীনার ফেরত দেন। এতে খুশী হয়ে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার ব্যবসায়ে বরকতের দু'আ করেন। তাতে ফল হয়েছিল এই যে, ঐ ব্যক্তি মাটি কিনলেও তাতে লাভ হতো' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৬৪২; আবূ দাঊদ হা/৩৩৮৪; মিশকাত, হা/২৯৩২)। কিন্তু এটি হলো সাধারণ বাজার দরের বিষয়। কিন্তু যখন ব্যবসায়ী ব্যক্তি বা সমিতি অন্যায়ভাবে মুনাফা লাভের জন্য একযোগে মূল্যবৃদ্ধি করবে, অন্যায় উদ্দেশ্যে মওজূদদারী করবে, প্রতারণামূলকভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়াবে, তখন সেটা যুলুম হবে, যা হারাম। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা অত্যাচার করো না এবং অত্যাচারিত হয়ো না' (আল-বাক্বারা, ২/২৭৯)। উবাদা ইবনুছ ছমেত (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'কারো ক্ষতি করাও যাবে না, ক্ষতি সহাও যাবে না' (ইবনু মাজাহ, হা/২৩৪০; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৮৬৭)। তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রতারণা করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১০২; মিশকাত, হা/২৮৬০)।

প্রশ্ন (৪৫) : আমি আমার মামাকে কিছু টাকা দিয়েছি। তিনি উক্ত টাকার সাথে নিজের কিছু টাকা দিয়ে দুটি দোকান তৈরি করে ভাড়া দিয়েছেন। সাথে সাথে যতদিন তিনি আমার ঐ টাকা পরিশোধ করতে না পারবেন ততদিন একটি দোকানের ভাড়ার টাকা আমাকে দিবেন। প্রশ্ন হলো, এই ধরনের চুক্তি বা চুক্তি থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ হালাল হবে কি?

-ছিয়াম
সিলেট সদর।

উত্তর : ইসলামী শরীআতে দুই ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য বৈধ। একটির নাম 'মুশারাকা' (مشاركة) অর্থাৎ শরীকানা ব্যবসা।

www.al-itisam.com

এতে লাভ অংশহারে বণ্টন হবে। অর্থাৎ যার যেমন অর্থ থাকবে, সে তেমন লভ্যাংশ পাবে (আবূ দাঊদ, হা/৪৮৩৬, সনদ ছহীহ; বুলূগুল মারাম, হা/৮৭০; নায়লুল আওতার, হা/২৩৩৪-৩৫)। অপরটির নাম 'মুযারাবা' (مضاربة) অর্থাৎ একজনের অর্থ এবং অপরজনের ব্যবসা। যাতে লাভ চুক্তি অনুযায়ী বণ্টন হবে (দারাকুত্বনী, হা/৩০৭৭; মুওয়াত্ত্বা, হা/২৫৩৫; ইরওয়াউল গালীল, হা/১৪৭২, ৫/২৯২; বুলূগুল মারাম, হা/৯০৫, মাওকূফ ছহীহ)। প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যবসাটি এ দুইটির মধ্যে কোনোটির অন্তর্ভুক্ত নয়। বিধায় তা জায়েয হবে না। তবে প্রদানকৃত টাকার লভ্যাংশ অনুপাতহারে গ্রহণ করলে তা জায়েয হতো। কেননা আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক ঋণ যা লাভ আনয়ন করে, সেটাই রিবা বা 'সূদ' (সিলসিলা ছহীহা, হা/১২১২; ইরওয়াউল গালীল, হা/১৩৯৬, ৫/২৩৫)।

অন্যান্য

প্রশ্ন (৪৬) : 'নাফস' ও 'ক্বলব'-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

-শাহাদত
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তর : 'নাফস' দ্বারা রূহ বা আত্মাকে বুঝানো হয় এবং কখনও কখনও আত্মা এবং দেহকে বুঝানো হয় (আল-বাক্বারা, ২/৫৭)। আর 'ক্বলব' দ্বারা অন্তরকে বুঝানো হয় যা এক অবস্থায় থাকে না, বরং বারবার পরিবর্তিত হয় (মারকাযুল ফাতাওয়া, ফতওয়া নং ৬১০১০)।

প্রশ্ন (৪৭) : ছেলে বা মেয়েদের নাম 'মাহী' রাখা যাবে কি?

-ফুয়াদ হাসান
গোদাগাড়ি, রাজশাহী।

উত্তর : 'মাহী' নাম রাখা যাবে। এ শব্দের অর্থ 'মোচনকারী'। তবে শব্দটি দ্বারা ছেলে সন্তানের নাম রাখতে হবে, কন্যা সন্তানের নয়। কেননা শব্দটি পুরুষ বাচক শব্দ। জুবাইর ইবনু মুতঈম রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমার পাঁচটি (প্রসিদ্ধ) নাম রয়েছে, আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ, আমি আল-মাহী, আমার দ্বারা আল্লাহ কুফর ও শিরককে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। আমি আল-হাশির, আর আমার চারপাশে মানব জাতিকে একত্রিত করা হবে। আমি আল-আক্বিব (সর্বশেষে আগমনকারী)' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৫৩২; ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৫৪)।

প্রশ্ন (৪৮) : হিন্দু প্রতিবেশী ভাইকে 'দাদা' বলে ডাকা যাবে কি?

-ইমরান আকন্দ
ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তর : অমুসলিমদের মাঝে প্রচলিত ও ব্যবহৃত শব্দসমূহে যদি ধর্মীয় কোনো দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা শিরক মিশ্রিত না থাকে, তাহলে সেসব শব্দে তাদের সম্বোধন করাতে কোনো অসুবিধা নেই। হিন্দু সমাজে সাধারণত বড় ভাইকে দাদা বলে সম্বোধন করা হয়। এতে ধর্মীয় ভাবাবেগ কিংবা শিরকের কোনো ব্যাপার নেই। তাই হিন্দুদের দাদা বলে সম্বোধন করাতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা এটা সামাজিক শিষ্টাচার। আর সামাজিক শিষ্টাচারে শিরক-বিদআত না থাকলে 'দাদা' বলে ডাকাতে কোনো সমস্যা নেই (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৬০; ছহীহ মুসলিম, হা/২৪)।

প্রশ্ন (৪৯) : কোনো নায়ক-নায়িকা সিনেমা করার পর ভুল বুঝতে পেরে সে পথ থেকে ফিরে এসে তওবা করল। অথচ তখনও বিভিন্ন মিডিয়ায় তার ছবিগুলো প্রদর্শিত হচ্ছে। যা বন্ধ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় সে কি ক্ষমা পাবে?

-আব্দুল্লাহ
তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : কোনো ব্যক্তি পাপ হতে খালেছ অন্তরে তওবা করে যদি সেই পাপ ছেড়ে দেয়, তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'বলুন! হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর যুলম করেছ; তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' (আয-যুমার, ৩৯/৫৩)। প্রশ্নে উল্লেখিত পরিস্থিতিতে তওবা করার পূর্বে যে সকল ভিডিও নিজের সাধ্যের মধ্যে রয়েছে তা ডিলেট করতে হবে। আর যা ডিলেট করা সম্ভব নয় তার জন্য সে ব্যক্তি দায়ী হবে না। কেননা সাধ্যের বাহিরে আল্লাহ বান্দার উপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেন না। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করো' (আত-তাগাবুন, ৬৪/১৬)।

প্রশ্ন (৫০) : ফাতেমা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে অনেকেই বলে, 'মা ফাতেমা'। এভাবে তাকে মা বলে সম্বোধন করা যাবে কি?

-আবু বকর
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র মুসলিম জাতির পিতৃতুল্য। আর স্ত্রীগণ তাদের মাতৃতুল্য। মহান আল্লাহ বলেন, 'নবী মুমিনদের নিজের চেয়েও কাছের। আর তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতৃতুল্য' (আল-আহযাব, ৩৩/৬)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীগণ মুমিনদের মা হিসাবে তাদের ক্ষেত্রে বলা হয় 'মা খাদিজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা, মা আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা'। কিন্তু ফাতেমা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হলেন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা। সেই হিসাবে তিনি মুমিনদের বোনতুল্য। তাই তাকে 'মা ফাতেমা' বলা যাবে না।

www.al-itisam.com

بسم الله الرحمن الرحيم

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন:

আল জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ (রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ, দিনাজপুর)

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Al Jamiah As Salafiya General Fund
Account No: 20501130204367701

Account Name: Al Jamiah As Salafiya Zakat Fund
Account No: 20501130204367417

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রম

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ- ঢাকা, রজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও গাইবান্ধা।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Baitul Hamd Jame Masjid Complex Fund
Account No: 20501130204367316

দাওয়াহ কার্যক্রম

মাসিক আল-ইতিছাম, আল-ইতিছাম টিভি, আল-ইতিছাম গবেষণাগার, আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, দাঈ নিয়োগ।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Al Itisam Dawah Fund
Account No: 20501130204367802

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রম

দুস্থ, ইয়াতীম শিক্ষার্থী প্রতিপালন।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Nibras Yatim Kollan Fund
Account No: 20501130204367600

ত্রাণ কার্যক্রম

দুর্যোগ কবলিত অঞ্চলে ত্রাণ সহায়তা ও শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ।

ব্যাংক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Account Name: Nibras Tran Tahbil Fund
Account No: 20501130204367903

বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ | সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

www.al-itisam.com

Monthly Al-Itisam الاعتصام 5th Year, 5th Part, March 2021, Price : 25.00

بسم الله الرحمن الرحيم

নাজাতের একমাত্র অবলম্বন! সালাফী মানহাজের অনুসরণ!

৫ম বার্ষিক সালাফী কনফারেন্স ২০২১

- তারিখ: ৪ ও ৫ মার্চ ২০২১
- রোজ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার
- সময় : ১ম দিন বাদ আছর হতে শুরু

স্থান: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ বীরহাটাব-হাটাব, বীরাবো, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

সভাপতি : শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
চেয়ারম্যান, নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন; প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ ও রাজশাহী।

বক্তব্য পেশ করবেন : দেশ বরেণ্য ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উলামায়ে কেরাম

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, বীরাবো, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

নিবরাস প্রকাশনী কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত ও পরিমার্জিত বই সমূহ

রিযিক্ব

পৃষ্ঠা : ৯৬ ■ মূল্য : ৭০ টাকা

লেখক : আব্দুল্লাহ আব্দুর রাযযাক

মানুষ মাত্রই রিযিক্ব নিয়ে চিন্তিত। রিযিক্বের চিন্তা মানুষকে এতটাই বিবেকহীন করে দেয় যে, হালাল-হারাম বিবেচনা করার মতো ফুরসতটুকুও সে পায় না। বৈধ-অবৈধ যেভাবেই হোক না কেন, অধিক থেকে অধিক উপার্জনের চেষ্টাই থাকে মুখ্য। আর এটাই ভোগবাদী দুনিয়ার সবচেয়ে নির্মম বাস্তবতা। যেখানে রিযিক্বের ক্ষেত্রে ভাগ্যের কথা বলা সেকেলে। যেখানে হালাল-হারামের বাছ-বিচার করা পাগলামির নামান্তর। রিযিক্বে বরকতের উপলব্ধি যেখানে গৌণ। 'দুনিয়াটা মস্ত বড়! খাও দাও! ফূর্তি করো!' এই বাক্যই যে জীবনের মূলমন্ত্র। এই বইয়ে আপনি দেখতে পাবেন বস্তুবাদী দুনিয়ার মূল্যহীন ও ধোঁকায় পরিপূর্ণ নিষ্ঠুর চেহারা। দেখবেন রিযিক্ব বৃদ্ধির সাথে আধ্যাত্মিকতার কী গভীর সম্পর্ক! অনুভব করবেন বরকতের বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তা। ধন-সম্পদের বিপরীতে খুঁজে পাবেন মানসিক শান্তির মূল্য। রিযিক্ব নিয়ে চিন্তিত প্রতিটি মানুষের চিন্তার উপশম, ক্ষুদার খোরক ও রোগের আরোগ্য রয়েছে বইটিতে।

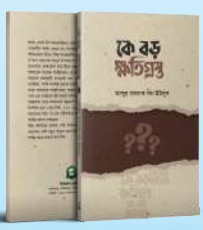

কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত

লেখক : আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

পৃষ্ঠা : ২৮০ ■ মূল্য : ১৫০ টাকা

তাফসির কি মিথ্যা হতে পারে?

লেখক : আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

পৃষ্ঠা : ১৯৬ ■ মূল্য : ১০০ টাকা

যোগাযোগ : নিবরাস প্রকাশনী

রাজশাহী শাখা : এমাদ আলী প্লাজা, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী। মোবা : ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬;
বাংলাবাজার শাখা : গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, নর্থব্রুক হল রোড, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবা : ০১৪০৭-০২১৮৫০

Al-itisam TV — কুরআন ও সুন্নাহকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার লক্ষ্যে

কুরআন সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার লক্ষ্যে আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর অফিসিয়াল মিডিয়া আল-ইতিছাম টিভি। শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ সহ অন্যান্য আলোচকদের কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক নিয়মিত দারস পেতে আল-ইতিছাম টিভি সাবস্ক্রাইব করুন!

www.facebook.com/alitisamtv www.youtube.com/c/alitisamtv